

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক



রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক

শৈলেশ ভড়

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রকাশক
শ্রীজগন্নাথ দত্ত, এম এ, বি এল,
১, কীর্তি মিত্র লেন
কলকাতা-৪

প্রথম প্রকাশ
১৩৭১
শ্রাবণ

মুদ্রক
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র নাগ
বঙ্গশ্রী প্রেস
১২।২, মদন-মিত্র লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
সুরেন দে

২.৫০

গ্রন্থকারের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীতরচনার সঙ্গে যাতে পরিচয় ঘটে এবং গায়কী রক্ষা করে সুষ্ঠু পরিবেশন-প্রণালীও যাতে আয়ত্ত হয় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে নবীন শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে বইখানি রচনা করেছি। তাঁরা উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ত্রিবেণী-সংগম', অধ্যাপক শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'কথা ও সুর', শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী', শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত', শ্রীশুভ গুহঠাকুরতার 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা' ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসের 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রসঙ্গ' থেকে। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণী।

গ্রন্থখানি প্রকাশের সময় নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন বন্ধুবর শ্রীঅনুপম রায় ও শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

উদীচী ভবন
১৭১ বি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলকাতা-৪

সূচী

উৎসর্গ

যাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় ও সহানুভূতিতে
রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জীবনের একমাত্র
পাথেয় করতে পেরেছি,
সেই পরমারাধ্য
পিতৃদেবের শ্রীচরণে

রচনাকাল

২৫শে বৈশাখ থেকে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

ভূমিকা

একথা স্বীকার করতেই হবে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার আগের চেয়ে এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দিনে দিনে এর পরিধি আরো বিস্তৃতি লাভ করবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মনে রাখতে হবে, নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা যা আমরা লাভ করেছি তা শুধু দুর্মূল্য নয়, অমূল্যও।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের অধ্যাপনা যাঁরা করেন রবীন্দ্র-সাহিত্য তাঁদের ভালো করে পড়া দরকার। তা না-হলে শিক্ষাদানে যথেষ্ট খুঁত থেকে যাবে। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ। সিদ্ধিলাভ করতে হলে রীতি-মত সাধনার প্রয়োজন। 'শুনে মেরে দেবার' জিনিস রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়। নবীন শিক্ষার্থীদের ও অভিভাবকদের একথাটা স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি।

'একাকী গায়কের নহে তো গান', তাই শ্রোতাদেরও এ বিষয়ে একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। শুধু গান শুনলেই হবে না, সত্যিকারের রবীন্দ্রসঙ্গীত হলো কি না সেটাও বিচার করতে হবে। সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত মাধুর্যকে শিল্পী ঠিকমত প্রকাশ করতে পারলো কি না সেটা শ্রোতাদের উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে বৈকি।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যে কারণেই হোক দিনেন্দ্রনাথ, কাঙ্গালীচরণ, পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী —লিখিত মূল স্বরলিপিগুলির কিছু-কিছু পরিবর্তন করে প্রকাশ করছেন। ফলে সুর কিছু-কিছু বদলাচ্ছে। তা-ছাড়া এমন গানের রেকর্ড আছে যার সঙ্গে প্রকাশিত স্বরলিপির কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।
রেকর্ড কর্তৃপক্ষ তাঁদের ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য সহজ সুরের এবং সহজ তালের গানগুলি রেকর্ড করে থাকেন। এমনকি একই গান হয়ত দুজন শিল্পী রেকর্ড করেন এবং দুশো শিল্পী বেতারে বা আসরে সেই গান পরিবেশন করেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের আড়াই হাজার গানের মধ্যে অনেক গানই অপ্রচলিত থেকে যায়।

'অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শিক্ষনীয়' নির্দেশ দিয়ে অনেকগুলি গান পাওয়া যায় স্বরবিতানে। এই 'অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের' সাক্ষাৎ পাওয়া বা তাঁদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করা যে কী দুরূহ ব্যাপার তা বোধহয় অনেকেই জানেন। কিংবা অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীর বাস হয়ত অনেক দূরে। তাঁর পক্ষে কী করে সম্ভব হবে এইসব গান আয়ত্ত করা? অথচ বাজারে এইসব গানের রেকর্ডের সংখ্যা খুব কম। এ বিষয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হলে সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে।

মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের দেশের নিজস্ব সম্পদ এবং এই সম্পদের সম্মান রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। শিক্ষার প্রসার ক্রমেই বাড়ছে এবং অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি সঙ্গীত সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমরা সকলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথার্থ সম্মান দিতে ও দেখাতে পারবো।

আমরা জানি রবীন্দ্র সঙ্গীতের সংখ্যা বিস্ময়কর এবং এর আলোচনাক্ষেত্র সুদূরপ্রসারী। অতএব প্রত্যেকটি গান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও একেবারে অসম্ভব। তাই সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যই এই পুস্তকের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য।

যে-কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করতে হলে শিল্পীকে চারটি বিষয়ে জানতে হবে। সে বিষয়গুলি হলো **১. বাণী ও উচ্চারণ, ২. সুর ও স্বরলিপি, ৩. ছন্দ ও লয়, ৪. ভাব ও রূপ।**
এই বিষয়গুলি নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও আনুষঙ্গিক

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে সব রচনায় সুরসংযোজনা করেছেন আমরা তাকেই বলি রবীন্দ্রসঙ্গীত। ছোটবেলায় তেরো-চোদ্দ বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে আশি বছর অবধি অর্থাৎ জীবনের শেষ অবধি এই রচনাকাল বিস্তৃত। এবং রচনার সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে কুড়ি বছর বয়স অবধি তিনি যে সব গান রচনা করেছেন তার সংখ্যা খুব অল্প এবং সেগুলি বিক্ষিপ্ত। তাই ক্রমবিকাশের আলোচনা থেকে আমরা সে গানগুলি বাদ দেব। এই ৬১ বছরের রচনাকে চারটি স্তরে বা যুগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম যুগ

১২৮৮-১৩০২ সাল

এই যুগে তিনি ভালো ভালো খানদানী 'ঘরোয়ানা চীজের' সুরকে আশ্রয় করে গান রচনা করেছেন। সে সময় ঠাকুর পরিবারে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের নিয়মিত আসর বসত। যদু ভট্ট, রাধিকা গোস্বামী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, বিষ্ণু চক্রবর্তী প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতগুণীদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন এবং তাঁদের গান শুনেছিলেন।

কবি বলেছেন, "বাঙালীর স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীতমুখরতা কোনো বাধা না পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের মত উৎসারিত হয়েছিল। ছেলেবেলায় যে গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল

সে সখের দলের গান নয়, তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা আপনি জমে উঠেছিল।”

সেই সময়কার বড় বড় ওস্তাদের মুখে তিনি ভালো ভালো চালের খেয়াল, ধ্রুপদ শুনতেন। তাঁর সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোতে সেই সুর নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন এবং রবীন্দ্রনাথকে সেই সুরে কবিতা লিখতে বলতেন।

এই যুগে তাঁর গান সুরধর্মী। রাগে এবং তালে শাস্ত্রীয়। বিষয়গুলি গুরুগম্ভীর। স্বতন্ত্র রচনা যে একেবারে ছিল না একথা বললে ভুল হবে, তবে সেগুলিতে পাশ্চাত্য ও প্রাদেশিক সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় যুগ

১৩০৩-১৩১৭

এ যুগের গানে পাওয়া গেল সেই খানদানী কাঠামোর ভিতরেই সুরের ও তালের নূতনত্ব। রাগের পুরোনো কাঠামোয় নতুন রং লাগলো, কিছু অলংকারও পরিয়েছেন দেখা গেলো। শাস্ত্রীয় মতে এ যুগের গানে তিনি 'সুরভ্রষ্ট' হয়েছেন বটে, তবে প্রতিভা বিকাশের একটা নতুন পথ তিনি পেয়েছেন বোঝা গেল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “আমাদের দেশের সঙ্গীত শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত ও অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, কেবল কতকগুলি সুরসমষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিনীর ছাঁচ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে, সঙ্গীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই।”

এ যুগের গানে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ তিনি মানছেন না, মুডের, খেয়ালের ও ভাবের প্রয়োজনের তাগিদে রাগিণীকে ওস্তাদের কবল থেকে মুক্ত করে মনোভাবের উপযোগী করে প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু অদল বদল ঘটিয়েছেন।

এক রাগের সঙ্গে অন্য রাগ মেশানোর জন্যে সুরের মধ্যে একটা নূতনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এই নূতনত্বের মধ্যে কোনো গুরুচণ্ডালী দোষ হচ্ছে কি না। রীতি-বিরুদ্ধ কাজ করার নামই গুরুচণ্ডালী। বিবাদী স্বরকে বাদী করা, আরোহণ অবরোহণের নিয়ম রক্ষা না করা, গুরুগম্ভীর ভাবকে চপল বা হাল্‌কা সুরে ব্যক্ত করা, ভারী সুরকে দ্রুত বা হাল্‌কা তালে বসানো ইত্যাদি। দেখা যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতে এরকম দোষ বর্তায় নি।

এ যুগের গানে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা মনে রাখতে হবে। ঝম্পক, রূপক্‌ড়া, নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চক তালগুলি রবীন্দ্রনাথ এই সময় সৃষ্টি করেন।

১৩১০ সালে পাওয়া গেলো :

১। গভীর রজনী নামিল—রূপক্‌ড়া

২। নিবিড় ঘন আঁধারে—নবতাল

৩। দুয়ারে দাও মোরে—একাদশী

১৩১৫ সালে পাওয়া গেল :

৪। জননী তোমার করুণ চরণখানি—নবপঞ্চক

১৩১৭ সালে পাওয়া গেল :

৫। আমারে যদি জাগালে আজি—ঝম্পক

এই যুগে রবীন্দ্রনাথ যে কেবল উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত রচনা করেছেন একথা মনে করলে ভুল হবে। বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের সুরের রচনাও কম নয়। ১৩১২ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক স্বদেশ-সঙ্গীত রচনা করেন এবং এই সময়কার সব গানেই তিনি লোকসঙ্গীতের সুর দেন।

তৃতীয় যুগ

১৩১৮-১৩৩২

এই যুগের গান সম্বন্ধে শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই যুগের শেষভাগে তিনি এক নতুন পরীক্ষা করলেন। শুধু এক সুরের

সঙ্গে সেই জাতেরই অন্য সুর মিশিয়ে তিনি সুখী হলেন না, সৃষ্টির এক নতুন উৎসের সন্ধান পেলেন। সে উৎস অতি নিকটেই ছিল, একেবারে হাতের কাছে। দ্বারের পাশে পল্লীগ্রামে। কবি চিরকালই পল্লীজীবনের ভক্ত, সহরের কৃত্রিমতা তাঁর কখনও ভালো লাগে না। তাঁর জীবনের বোধহয় সবচেয়ে সুখের সময় ছিল যখন তিনি পদ্মার দু ধারের গ্রামের ঘাটে নৌকা ভেড়াতেন। মাঠে, ঘাটে, নদীর ধারে, তিনি বৈরাগীর বাউল ভাটিয়াল, মাঝিদের সারি গান, পল্লী-উৎসবের ঐক্যসঙ্গীত শুনে বেড়াতেন—তাঁর প্রাণে ঐ প্রকার গানের সুরের আবেগ, ভাবের সরল স্বাধীনতা ও গভীরতা সাড়া দিত। নিতান্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মত তিনি এই পল্লীসঙ্গীত, এই লোকসঙ্গীতের মর্ম গ্রহণ করলেন। এইখানেই তাঁর প্রতিভা। জীবনের সমস্ত ধারাকে নিজের সৃষ্টির মধ্যে বহমান করানো প্রতিভার কাজ।···সেইজন্য রবিবাবুর গানে তৃতীয় স্তরে ভাটিয়াল বাউলের আগমন লক্ষ্য করি। এই যুগের গানে দরবারী সুর-পদ্ধতির সঙ্গে ভাটিয়াল বাউলের মিশ্রণ হয়েছে।”

চতুর্থ যুগ

১৩৩৩-১৩৪৮ সাল

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্যে, তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশ রূপের বাহন।”

এই যুগের গানগুলি তাঁর গানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কথাগুলি গীতাঞ্জলির কথার মত নয়, তবু এর মধ্যে সংযম আছে, সৌষ্ঠব আছে। কথা ও সুরের মিল হরগৌরীর মতো। আবেদন মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী। মাটির প্রতিমায় প্রাণস্পন্দনের সাড়া পাওয়া গেলো। লোকসঙ্গীতের গ্রাম্যতা কিংবা রাগসঙ্গীতের তানের নিরর্থক গুণ্ডামি এই দুটির কোনটিই এযুগের গানে নেই। অথচ তাদের সদ্‌গুন সবই এসব গানের মধ্যে পাওয়া যায়। লোকসঙ্গীতের ভাবসম্পদ আছে

এবং দরবারী সঙ্গীতের সূক্ষ্ম অনুভূতিও আছে। সৃষ্টি তখনই সুন্দর হয় যখন সেটি জীবনধর্মের অনুগমন করে।

এই যুগে রবীন্দ্রনাথের আর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল—তাঁর নৃত্যনাট্যগুলি। একটি গল্পকে নৃত্যের মধ্য দিয়ে সঙ্গীতের সাহায্যে প্রকাশ করা নৃত্যনাট্যের উদ্দেশ্য। চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা এই সময় রচিত হয়। নৃত্যনাট্য এবং সঙ্গীতের এমন অপূর্ব সমন্বয় তাঁর পূর্বে আর কোনো গীতিকার করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের এই নৃত্যনাট্যগুলি সেদিক থেকে অভূতপূর্ব ও অভিনব।

পরিণত বয়সে নানা অভিজ্ঞতার শেষে রবীন্দ্রনাথ যে সব গান রচনা করলেন তার তুলনা ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে আর কখনো পাওয়া যায় নি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের সঙ্গীত জিনিসটাই ভূমার সুর—তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করে দেবার জন্যই।"

এককথায় বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের মত composer আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত জন্মায় নি।

প্রথম গান

কবির প্রথম গান সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। যতদূর জানা যায় ১২৮১ সালের মধ্যে রচিত হয় 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে।' এই গানটি কবির প্রথম রচনা। কিন্তু এটি একটি বিখ্যাত শিখ-ভজন 'গগনোমে থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনি' গানটির ভাষান্তর।

কবির সর্বপ্রথম স্বাধীন রচনা 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়।' এই গানটিতে তিনি সুরও দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে এটিকে ভদ্র ছন্দে শুদ্ধ করে প্রকাশ করেছিলেন ভারতীতে। দুঃখের বিষয়

প্রথম রচনাটি যথাযথ পাওয়া যায় নি। বর্তমানে যে গানটি মুদ্রিত সে সম্বন্ধে কবি বলেছেন, 'এ গান সে গান নয়।'

১২৮২ সালের মধ্যে রচিত 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটি পরবর্তী স্বাধীন রচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথ এটি রচনা করেন। ১২৮৬ সালের মধ্যে রচিত হয় 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'। কিন্তু এ-দুটির কোনোটিতে কবি স্বয়ং সুর দিয়েছিলেন কি না সে সম্বন্ধে কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই।

রবীন্দ্রনাথ সবদিক দিয়ে কোন গানকে নিজের প্রথম স্বাধীন রচনা বলে স্বীকার করেছেন তার সন্ধান পাই জীবনস্মৃতিতে—

"এই শাহিবাগ প্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোটো ঘরে আমার আশ্রয় ছিল।...শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।"

শেষ গান

'হে নূতন, দেখা দিক আরবার' গানটি কবির জীবনের সর্বশেষ গান। কবি বহুদিন পূর্বে ২৫শে বৈশাখ ১৩২৯ সালে পূরবী কাব্যগ্রন্থের 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি রচনা করেন। এই কবিতাটির শেষের দিকের কতগুলি ছত্র সামান্য একটু পরিবর্তন করে ২৩শে বৈশাখ ১৩৪৮ সালে সুরসংযোজনা করেন। বলা বাহুল্য, ঐ বছরেই ২২শে শ্রাবণ তাঁর মৃত্যু হয়।

বর্তমানে তাঁরই জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে এই সর্বশেষ গানটি পরিবেশিত হয়ে থাকে।

বৎসর অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য রচনা তালিকা

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-রচনার একটি তালিকা বৎসর অনুযায়ী দেওয়া গেলো। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশের আলোচনাকাল ধার্য করা হয়েছে ১২৮৮ থেকে ১৩৪৮ সাল অর্থাৎ ৬১ বৎসর।

১২৮৮ সাল অর্থাৎ কবির ২০ বছর বয়সের আগে অবধি তিনি যে-সব সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তার কয়েকটি উল্লেখ করা গেল।

১। তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা—ধর্ম
২। নীরব রজনী দেখো—প্রেম
৩। খুলে দে তরণী—প্রেম
৪। জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুন—প্রেম
৫। তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ—স্বদেশ
৬। একি অন্ধকার এ ভারতভূমি— ,,
৭। একসূত্রে বাঁধা আছি— ,,
৮। আঁধার শাখা উজল করি—প্রেম
৯। শুন নলিনী খোল গো আঁখি— ,,
১০। বলি, ও আমার গোলাপ-বালা— ,,

১২৮৮—বাল্মিকী প্রতিভার গানগুলি রচিত হয়।

১২৮৯—এই বছর রচিত হল কালমৃগয়া গীতিনাট্য। এই নাটকের অনেক গান পরে বাল্মিকী প্রতিভায় স্থান পেয়েছে।

১২৯০—এই বছরে রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান :

১। সারা বরষ দেখিনে মা—স্বদেশ
২। মনে রয়ে গেল মনের কথা—প্রেম
৩। হেদে গো নন্দরানী—শিশু

১২৯১—এই বছরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান :

১। আমার প্রাণের পরে চলে গেলো—প্রেম
২। বুঝি বেলা বহে যায়— ,,
৩। মরি লো মরি, আমায়— ,,
৪। বনে এমন ফুল ফুটেছে— ,,

১২৯২—এই বছরে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানটিতে সুর সংযোজনা করেন। স্বতন্ত্র রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান :

একবার তোমরা মা বলিয়া ডাক—স্বদেশ

১২৯৩—এই বছর পাওয়া গেল হিন্দুস্থানী গানের সুর নিয়ে সঙ্গীত রচনা। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান :

১। প্রভাতে বিমল আনন্দে—ধর্ম
২। সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি— "
৩। কখন বসন্ত গেলো—প্রেম
৪। নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে—ধর্ম
৫। ওগো শোনো কে বাজায়—প্রেম
৬। আমরা মিলেছি আজ—স্বদেশ
৭। ওগো কে যায়—প্রেম
৮। আগে চল আগে চল—স্বদেশ
৯। তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ—স্বদেশ

১২৯৪—এই বছরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান :

১। আবার মোরে পাগল করে—ধর্ম
২। তুমি আপনি জাগাও— "
৩। তোমারি ইচ্ছা হউক— "
৪। নাথ হে, প্রেম পথে— "
৫। তবু মনে রেখো—প্রেম

১২৯৫—মায়ার খেলা গীতিনাট্য রচনা। এবং স্বতন্ত্র রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গান :

দাঁড়াও আমার অাঁখির আগে—ধর্ম

১২৯৬—এই বছর রাজা ও রানী নাটকের গানগুলি রচিত হল :

১। আমারে কে নিবি ভাই—ধর্ম
২। এরা পরকে আপন করে—প্রেম
৩। সখি ঐ বুঝি বাঁশি বাজে— "

১২৯৭—এ বছরে সঙ্গীত রচনার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

১২৯৮—এ বছরেও সঙ্গীত রচনার কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই।

১২৯৯—কয়েকটি রচনা :

১। আনন্দ-ধ্বনি জাগাও গগণে—স্বদেশ
২। তোমরা হাসিয়া বহিয়া—প্রেম
৩। খাঁচার পাখি ছিল—কাব্য
৪। যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে—কৌতুক

১৩০০—ছুটি উল্লেখযোগ্য রচনা :

১৩০১—একটি বিশিষ্ট রচনা :

১। আমার পরান লয়ে কি খেলা—ধর্ম

১৩০২—এই বছরের ছুটি রচনা :

১। বাজিল কাহার বীণা—ধর্ম
২। বড় বিস্ময় লাগে— „

১২৯৭ থেকে ১৩০২ অবধি সঙ্গীত রচনার সংখ্যা খুবই কম পাওয়া যায়। এই কয় বছর তিনি সাহিত্য সাধনায় মগ্ন ছিলেন :

১৩০৩—এই বছর বহুবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনার সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দি ভাঙা ও মহীশূরী ভজনের সুরের রচনার সংখ্যা বহু :

১। আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে—ধর্ম
২। এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ— „
৩। চিরবন্ধু চির নির্ভয়— „
৪। হৃদয় নন্দনবনে— „
৫। আনন্দধারা বহিছে ভুবনে— „
৬। এ পরবাসে রবে কে— „

৭। আজি বহিছে বসন্ত পবন—ধর্ম
৮। ওহে জীবনবল্লভ— ,,
৯। এসো হে গৃহদেবতা—আনুষ্ঠানিক
১০। অন্ধজনে দেহ আলো— ,,
১১। কেন বাজাও কাঁকন—প্রেম

১৩০৪

১। সুধা-সাগর তীরে—ধর্ম
২। বেঁধেছ প্রেমের পাশে—ধর্ম
৩। অয়ি ভুবনমনোমোহিনী—স্বদেশ
৪। সুখে থেকো আর—আনুষ্ঠানিক
৫। সখি প্রতিদিন হায়—প্রেম
৬। আমি কেবলি স্বপন—,,
৭। তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা—,,

১৩০৫

১। হেরিয়া শ্যামল ঘন—প্রেম

১৩০৬

১। ভয় হতে তব—ধর্ম
২। জানি হে যবে প্রভাত হবে—,,

১৩০৭

১। তোমার পতাকা যারে দাও—ধর্ম
২। তোমারি রাগিনী জীবন-কুঞ্জে—,,
৩। যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার—,,

১৩০৮—এই বছর 'নৈবেদ্য' প্রকাশিত হয়।

১। মোরা সত্যের পরে মন—,,
২। প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী—,,
৩। অন্ন লইয়া থাকি—,,
৪। জীবনে আমার যত আনন্দ—ধর্ম
৫। সকল গর্ব দূর করি দিব—,,

১৩০৯

১। মোরে ডাকি লয়ে যাও—,,

২। বল দাও মোরে বল দাও—,,

৩। সফল করো হে প্রভু—,,

৪। আমি কী বলে করিব নিবেদন—,,

১৩১০—রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নূতন কয়েকটি তালের সঙ্গীত রচনা এই বছর সর্বপ্রথম পাওয়া গেল। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান :

১। বাজাও তুমি কবি—ধর্ম

২। বাণী তব ধায়— ,,

৩। সুন্দর বহে আনন্দ— ,,

৪। পান্থ এখনো কেন— ,,

৫। বিমল আনন্দে জাগোরে—,,

৬। মন্দিরে মম কে— ,,

৭। কে বসিলে আজি— ,,

৮। হৃদয়-বাসনা পূর্ণ হল—,,

৯। সুখহীন নিশিদিন—,,

১০। গভীর রজনী নামিল—,,

১১। নিবিড় ঘন আঁধারে— ,,

১২। দুয়ারে দাও মোরে— ,,

১৩। ডাকো মোরে—,,

১৪। জননীর দ্বারে আজি ঐ—স্বদেশ

১৫। আমার প্রাণের মানুষ—ধর্ম

১৩১১

১। আমি চঞ্চল হে—প্রেম

২। মহাবিশ্বে মহাকাশে—ধর্ম

১৩১২—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নিয়ে স্বদেশ-সঙ্গীতের রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। এবং এই সময়ের রচনাতেই লোকসঙ্গীতের সুর যোজনা লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় সাধারণের গাইবার সুবিধার জন্য

তিনি এই সুর দেন। একসঙ্গে এত স্বদেশ-সঙ্গীতের রচনা আর কখনো হয় নি।

১। এবার তোর মরা গাঙে—স্বদেশ
২। যদি তোর ডাক শুনে কেউ— „
৩। আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে—„
৪। আজি তুই পরের দ্বারে—„
৫। ছি ছি চোখের জলে—„
৬। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক—„
৭। যে তোরে পাগল বলে—„
৮। ওরে তোরা নেই বা কথা বললি—„
৯। যদি তোর ভাবনা থাকে—„
১০। আপনি অবশ হলি—„
১১। বাংলার মাটি বাংলার জল—„
১২। ওদের বাঁধন যতই—„
১৩। বিধির বাঁধন কাটবে—„

১৩১৩

১। আমি বহু বাসনায়—ধর্ম
২। কত অজানারে— „

১৩১৪

১। তব সিংহাসনের আসন হতে—ধর্ম
২। তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে—„
৩। আমার মাথা নত করে দাও— „
৪। বিপদে মোরে রক্ষা কর— „
৫। অন্তর মম বিকশিত কর— „
৬। আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—প্রকৃতি (বসন্ত)
৭। আমার নয়ন ভুলানো এলে—প্রকৃতি (শরৎ)

১৩১৫—সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্যে এবছরের রচনা অনেক। শারদোৎসব নাটকের বহু গান এই বছরে রচিত। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান :

১। আঁখিজল মুছাইলে—ধর্ম

২। চরণধ্বনি শুনি— ধর্ম
৩। প্রচণ্ড গর্জনে আসিল—,,
৪। এ ভারতে রাখো—স্বদেশ
৫। বীণা বাজাও হে—ধর্ম
৬। তোমার সোনার থালায়—,,
৭। আজি ঝড়ের রাতে—প্রকৃতি (বর্ষা)
৮। মেঘের পরে মেঘ—,,
৯। যে তরণীখানি ভাসালে—আনুষ্ঠানিক (বিবাহ)
১০। বাজে বাজে রম্য বীণা—ধর্ম
১১। জননী তোমার করুণ চরণখানি—,,
১২। ও আমার দেশের মাটি—স্বদেশ
১৩। আমরা পথে পথে যাবো—স্বদেশ

১৩১৬—প্রায়শ্চিত্ত নাটকের গান এবং কয়েকটি স্বতন্ত্র রচনা :

১। রূপসাগরে ডুব দিয়েছি—ধর্ম
২। তুমি কেমন করে গান করো—,,
৩। আমার মিলন লাগি—,,
৪। এই যে তোমার প্রেম ওগো—,,
৫। একটি নমস্কারে প্রভু—,,
৬। আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে—প্রকৃতি (বসন্ত)
৭। ওই আসনতলের মাটির পরে—ধর্ম
৮। প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত—,,
৯। শরতে আজ কোন অতিথি—প্রকৃতি (শরৎ)
১০। আজ প্রথম ফুলের— ,,
১১। আজি শ্রাবণ ঘন-গহন মোহে—প্রকৃতি (বর্ষা)
১২। আজ বারি ঝরে ঝর ঝর— ,,

১৩১৭—রাজা নাটকের গানগুলি এবছরের রচনা।

১। বিশ্ব যখন নিদ্রামগন— ধর্ম
২। যতবার আলো জ্বালাতে চাই—,,
৩। যেথায় থাকে সবার অধম—,,

৪। সীমার মাঝে অসীম তুমি—ধর্ম
৫। এবার নীরব করে দাও হে—,,
৬। জীবন যখন শুকায়ে যায়—তথ্য
৭। আমারে যদি জাগালে আজি—প্রকৃতি (বর্ষা)
৮। বসন্তে কি শুধু কেবল— (বসন্ত)
৯। আজি দখিন-দুয়ার খোলা— ,,
১০। বিরহ মধুর হল আজি—প্রেম
১১। আমি রূপে তোমায়— ,,
১২। ঐরে তরী দিল খুলে—ধর্ম
১৩। কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ—,,
১৪। হে মোর চিত্ত—স্বদেশ
১৫। আবার এসেছে আষাঢ়—প্রকৃতি (বর্ষা)
১৬। নদীপারের এই আষাঢ়ের— ,,
১৭। আজি কমলমুকুলদল—প্রকৃতি (বসন্ত)
১৮। ডাকে বারবার ডাকে—ধর্ম
১৯। রাখো রাখোরে জীবনে—,,

১৩১৮—অচলায়তন নাটকের গানগুলি এই বছরে রচিত। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' এই বছরে রচিত হয় মাঘোৎসবের জন্য। কয়েকটি গান :

১। যিনি সকল কাজের কাজী—ধর্ম
২। সকল জনম ভরে— ,,
৩। আমরা চাষ করি আনন্দে—আনুষ্ঠানিক
৪। আলো আমার আলো ওগো—ধর্ম
৫। উতল ধারা বাদল ঝরে—প্রকৃতি (বর্ষা)
৬। সব কাজে হাত লাগাই মোরা—আনুষ্ঠানিক
৭। ঘরেতে ভ্রমর এলো—প্রেম
৮। তুমি ডাক দিয়েছ—ধর্ম
৯। ও অকূলের কূল—,,
১০। জনগণমন-অধিনায়ক—স্বদেশ (জাতীয় সঙ্গীত)

১৩১৯—গীতিমাল্যের গান রচিত হল, কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা :

১। তুমি একটু কেবল বসতে দিও—প্রেম
২। পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ—ধর্ম
৩। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে—,,
৪। আজিকে এই সকালবেলাতে—,,
৫। এমনি করে ঘুরিব— ,,
৬। এবার তোরা আমার যাবার—,,
৭। ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো—প্রেম
৮। সময় কারো যে নাই—ধর্ম

১৩২০—গীতিমাল্যের গান ছাড়াও হিন্দি-ভাঙা গান পাওয়া যায়।

১। যদি প্রেম দিলেনা প্রাণে—ধর্ম
২। যে রাতে মোর দুয়ারগুলি—,,
৩। যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা—,,
৪। আমার সকল কাঁটা ,,
৫। অসীম ধন তো আছে—
৬। আমাদের যাত্রা হল শুরু—স্বদেশ
৭। আমাদের শান্তিনিকেতন—আনুষ্ঠানিক
৮। কার মিলন চাও—ধর্ম
৯। জয় তব বিচিত্র আনন্দ—,,
১০। জাগ জাগরে জাগ সঙ্গীত—,,
১১। তিমিরময় নিবিড় নিশা—,,
১২। প্রথম আদি তব শক্তি—,,
১৩। জাগে নাথ জ্যোৎস্নারাতে—

১৩২১—গীতালির ১০৮টি গান রচিত হল এই বছরের ভাদ্র থেকে কার্তিকের মধ্যে—কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা—

১। তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে—ধর্ম
২। আমার হিয়ার মাঝে—,,
৩। এই লভিনু সঙ্গ—,,
৪। মোর সন্ধ্যায় তুমি—,,

৫। এই তো তোমার আলোক ধেনু ধর্ম
৬। তার অন্ত নাই গো ,,
৭। আগুনের পরশমণি ,,
৮। মেঘ বলেছে যাব যাব ,,
৯। শরৎ তোমার অরুণ আলোর—প্রকৃতি (শরৎ)
১০। তোমার খোলা হাওয়া—ধর্ম
১১। হৃদয় আমার প্রকাশ হল ,,
১২। এই শরৎ আলোর কমল বনে—প্রকৃতি (শরৎ)
১৩। আমারে দিই তোমার হাতে—,,

১৩২২ ফাল্গুনী নাটকের ২৯টি গান রচিত হয়।

১৩২৩-১৩২৫—গীতপঞ্চাশিকার অর্থাৎ স্বরবিতান ১৬ প্রকাশিত গানগুলি। ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্রমাসের মধ্যে রচিত হলো গীতিবীথিকা বা স্বরবিতান ৩৪এর গানগুলি।

১৩২৬—'রাজা' নাটকটির পরিবর্তিত রূপ 'অরূপরতন' পাওয়া গেল।

১৩২৭—এই বছর সঙ্গীত রচনার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

১৩২৮—জনপ্রিয় বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান এই বছর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করলেন। তাছাড়া কয়েকটি রচনা :

১। আমারে ডাক দিল কে—লোকসঙ্গীত
২। কেন যে মন ভোলে—প্রেম
৩। হেমন্তে কোন বসন্তেরি বাণী—প্রকৃতি (হেমন্ত)
৪। শীতের হাওয়ার লাগল নাচন— ,, (শীত)
৫। দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া—ধর্ম

১৩২৯—এই বছর মুক্তধারা নাটক এবং 'বসন্ত' গীতিনাট্য রচিত হল, এবং কয়েকটি নূতন গানও পাওয়া গেল।

১। অগ্নিশিখা এসো এসো—তথ্য
২। ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী—প্রকৃতি (বসন্ত)
৩। আমি কান পেতে রই—ধর্ম

৪। জয় হোক জয় হোক—ধর্ম
৫। তোমার সুরের ধারা— „
৬। নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র—আনুষ্ঠানিক
৭। আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল—কৌতুক
৮। ফিরে চল মাটির টানে—আনুষ্ঠানিক
৯। এসো এসো হে তৃষ্ণার জল—তথ্য
১০। পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে—প্রকৃতি (শীত)
১১। ও চাঁদ চোখের জলের—প্রেম
১২। ওরে কী শুনেছিস— „
১৩। দুই হাতে কালের মন্দিরা—তথ্য

১৩৩০-৩১—জাপান, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইতালি ভ্রমণের জন্য রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত রচনার অবকাশ পান নি। জাপান থেকে ফিরে এসে একটি 'চা-চক্র' প্রবর্তন করলেন। সেই উপলক্ষ্যে রচনা—

হায় হায় হায় দিন চলি যায়—কৌতুক

১৩৩২—হিন্দিভাঙা পাঁচটি গানের রচনা পাওয়া গেলো এবং 'গৃহপ্রবেশ' ও চিরকুমার সভা নাটকের কয়েকটি গান। তাছাড়া—

১। অশ্রুভরা বেদনা—প্রকৃতি (বর্ষা)
২। এসো শরতের অমল মহিমা—(শরৎ)
৩। কার বাঁশী নিশিভোরে— „
৫। কোথা যে উধাও—প্রকৃতি (বর্ষা)
৬। হে ক্ষণিকের অতিথি—প্রেম
৭। আমার রাত পোহাল—শরৎ
৮। এবার অবগুণ্ঠন খোলো—„
৯। এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে—বর্ষা
১০। ওলো শেফালি ওলো শেফালি—শরৎ
১১। বাজোরে বাঁশরী বাজো—প্রেম
১২। জীবনে মরণের সীমানা ছাড়ায়ে—ধর্ম

১৩৩৩—এই বছর শোধবোধ, নটীর পূজা, রক্তকরবী ইত্যাদি নাটকের অন্তর্ভুক্ত গানগুলি পাওয়া যায়। কয়েকটি স্বতন্ত্র রচনা—

১। এসো এসো প্রাণের উৎসবে—তথ্য
২। জ্বলেনি আলো অন্ধকারে—ধর্ম
৩। নিশীথে কী ক'য়ে গেল—প্রেম
৪। শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার—বর্ষা
৫। আর রেখো না আঁধারে—ধর্ম
৬। পথে যেতে ডেকেছিলে— "
৭। হে মহাজীবন— "

১৩৩৪—'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালার' গানগুলি এ বছরের রচনা। তাছাড়া কবির সুমাত্রা, বালি, জাভা ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণের জন্য সঙ্গীত রচনার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। কয়েকটি রচনা—

১। এসো হে বৈশাখ—প্রকৃতি (গ্রীষ্ম)
২। কেন পান্থ হে চঞ্চলতা—(বর্ষা)
৩। গগনে গগনে আপনার মনে—"
৪। তপের তাপের বাঁধন কাটুক—"
৫। নৃত্যের তালে তালে— "
৬। মধ্যদিনে যবে গান—(গ্রীষ্ম)
৭। মুখখানি কর মলিন বিধুর—প্রেম
৮। শীতের বনে কোন সে কঠিন—(শীত)

১৩৩৫—'শেষরক্ষা' নাটক এবং এই বছরের কয়েকটি রচনা—

১। যাবার বেলা শেষ কথাটি—প্রেম
২। লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা—প্রেম
৩। হায়রে ওরে যায় না কি জানা— "
৪। তোমার আমার এই—ধর্ম
৫। এবার মিলন হাওয়ায়—প্রেম
৬। কাছে যবে ছিল— "
৭। জয় করে তবু ভয় কেন—"

১৩৩৬—তপতী গীতিনাট্যের গানগুলি এ বছরের রচনা, তাছাড়া আরো কয়েকটি গান এ বছরে পাওয়া যায়—

১। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে—প্রেম
২। তুমি বাহির থেকে দিলে—ধর্ম
৩। তুমি হঠাৎ হাওয়ায়— „

১৩৩৭—'নবীন' গীতিনাট্য—

১৩৩৮—শাপমোচন নাটকের গান এই বছরের রচনার অন্তর্ভূক্ত। 'কৃষ্ণকলি' কবিতায় এই বছর সুর যোজিত হয়। কয়েকটি দক্ষিণী সুরের গান পাওয়া যায় এই সময়।

১। এসো আমার ঘরে এসো—প্রেম
২। ও কি এলো ও কি এলো না—„
৩। বাসন্তী হে ভুবন মোহিনী—মাদ্রাজী সুর
৪। বাজে করুণ সুরে— „
৫। নীলাঞ্জন ছায়া— „

১৩৩৯—এ বছরের কিছু সময় পুণা, পারস্য ও ইরাক ভ্রমণে কাটে। সঙ্গীত রচনার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

১৩৪০—মহুয়া কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি রচনায় সুর দেন এই বছর। তাছাড়া তাসের দেশের গানগুলি এ বছরের রচনা। কয়েকটি রচনা—

১। আমি তোমার মাটির কন্যা—ধর্ম
২। তোমায় সাজাব যতনে—প্রেম
৪। হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু—প্রকৃতি (বর্ষা)
৫। ওগো বধূ সুন্দরী—আনুষ্ঠানিক (বিবাহ)

১৩৪১—কয়েকটি রচনা এ বছরে রচিত :

১। মায়াবন বিহারিণী—প্রেম
২। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা—ধর্ম
৩। পিনাকেতে লাগে টঙ্কার—„

৪। হে সখা, বারতা পেয়েছি—প্রকৃতি (বসন্ত)
৫। কোন গহন অরণ্যে তারে—প্রেম
৬। দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে— ,,
৭। না চাহিলে যারে— ,,
৮। বঁধু কোন মায়া লাগলো— ,,

১৩৪২—এ বছর কবির রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা ও ভ্রমণে কাটে। 'হৈ হৈ সঙ্ঘে'র জন্য রচিত হয় কয়েকটি কৌতুকগীতি। কয়েকটি রচনা :

১। কাঁটাবন-বিহারিনী—কৌতুক
২। না গান গাওয়ার দল—,,
৩। পায়ে পড়ি শোন ভাই—,,
৪। জানি জানি তুমি—প্রেম
৫। নীল নবঘন আষাঢ় গগনে (রচনা—১৩০৭)—প্রকৃতি বর্ষা
৬। হৃদয় আমার নাচেরে ,, ,,
৭। আজি বরিষণ মুখরিত ,, ,,

১৩৪৩—চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের গানগুলি এ বছরের রচনা। তাছাড়া কয়েকটি গান :

১। বিনা সাজে সাজি---প্রেম
২। ভোর থেকে আজ—প্রকৃতি (বর্ষা)

১৩৪৪—এই বছর রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বর্ষাসঙ্গীত :

১। আজি গোধুলি লগনে
২। আমার প্রাণের মাঝে
৩। আমি তখন ছিলেম মগন
৪। আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ
৫। এসো শ্যামল সুন্দর
৬। ওগো আমার চির অচেনা
৭। গোধুলি গগনে মেঘে
৮। চিনিলে না আমারে কি—প্রেম

৯। থামাও রিমিকি ঝিমিকি

১০। মধু গন্ধে ভরা

১১। মনে কি দ্বিধা রেখে—প্রেম

১২। মেঘছায়ে সজল বায়ে

১৩। শ্রাবনের পবনে আকুল

১৩৪৫—'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত এই বছরের রচনা। এই বছর অগ্রহায়ণে 'মায়ার খেলা' নৃত্যনাট্যের পুনর্বিন্যাস ঘটে। কয়েকটি বিশিষ্ট প্রেমসঙ্গীত—

১। ওগো ডেকো না মোরে

২। ওগো কিশোর আজি

৩। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী

১৩৪৬—'শ্যামা' নৃত্যনাট্য এই বছরে রচিত হয়। এবং এই বছর ডাকঘর নাটকের জন্য নূতন সাতটি গান রচনা করেন।

১৩৪৭—কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা—

১। এসেছিনু দ্বারে তব

২। এসেছিলে তবু আস নাই

৩। এসো গো জেলে দিয়ে যাও

৪। ওগো তুমি পঞ্চদশী

৫। ধূসর জীবনের গোধূলিতে

৬। বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল

৭। স্বপ্নে আমার মনে হলো

৮। নহ মাতা, নহ কন্যা

৯। ঐ মহামানব আসে

১৩৪৮—এই বছর ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য নূতন সঙ্গীত রচনা সম্ভব হয় নি। প্রয়োজনের তাগিদে পূর্বলিখিত একটি কবিতার অংশ বিশেষে সুর সংযোগ করেন। তা হলো—

১। হে নূতন দেখা দিক (জন্মদিনের জন্য রচিত)

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাণী ও উচ্চারণ

বাণী বলতে আমরা বুঝবো রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাব্যাংশকে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কাব্যাংশের মূল্য বড় কম নয়। পরিবেশনের সময় এর মর্যাদা সব সময় রক্ষা করতে হবে। ভুল কথা বা ভুল উচ্চারণ সঙ্গীতের রস পরিবেশনে যথেষ্ট ক্ষতি করবে। সেইজন্যে কাব্যাংশটি আগে ভালো করে পড়ে বুঝে নেওয়া দরকার।

এই কাব্যাংশকে আমরা দশটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। ১. ধর্মসঙ্গীত ২. প্রেম ৩. স্বদেশ ৪. প্রকৃতি ৫. আনুষ্ঠানিক ৬. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ৭. কৌতুক গীতি ৮. তথ্যসঙ্গীত ৯. কাব্যসঙ্গীত ১০. শিশুসঙ্গীত।

১. ধর্ম-সঙ্গীত

এই পর্যায়ের রচনাকাল কবির প্রথম জীবন থেকে শেষ জীবন অবধি বিস্তৃত। এবং এর সুরবৈচিত্র্যও লক্ষ্যনীয়। রচনার সংখ্যা প্রায় একহাজার। তবে ধর্মসঙ্গীতের রচনা প্রথম যুগেই বেশী করে পাওয়া যায়। তার কারণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ বাল্যজীবনে যে পারিবারিক পরিবেশ পেয়েছেন তা ধর্মসঙ্গীত রচনারই অনুকূল। ধর্মজ্ঞানী পিতা মহর্ষিকে গান শোনাতে হত তাঁকে। একবার মহর্ষি কবির গান শুনে পাঁচশো টাকার একটি চেক উপহার দেন এবং বলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।'

এইরূপে নানাভাবে কবির মনে প্রেরণা জাগে। তা-ছাড়া সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

সুরযোজনা ক্ষেত্রেও ধর্মসঙ্গীতে বহু বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শুদ্ধরাগ, মিশ্ররাগ, হিন্দিভাঙা গান, লোকসঙ্গীতের সুর ইত্যাদি অনেক রকম সুরের প্রকাশ পাওয়া যায় এই ধর্মসঙ্গীতে। তাছাড়া যে ছয়টি নূতন তাল রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন তার অধিকাংশ রচনাই ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যায়। সংখ্যানুপাতে ধর্মসঙ্গীত সবচেয়ে বেশি এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য এই রচনার মধ্যে বর্তমান।

ধর্মসঙ্গীতের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেলো :

১। আজি বহিছে বসন্ত (ধ্রুপদ)
২। প্রথম আদি তব শক্তি ,,
৩। শুভ্র আসনে বিরাজ ,,
৪। সুধা-সাগর তীরে ,,
৫। জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে ,,
৬। ডাকে বারবার ডাকে (খেয়াল)
৭। নয়ান ভাসিল জলে ,,
৮। আনন্দধারা বহিছে ,,
৯। চরণধ্বনি শুনি ,,
১০। হৃদয় নন্দন বনে ,,
১১। বাজে বাজে রম্য বীণা (ভজন)
১২। এ হরি সুন্দর ,,
১৩। গগনের থালে ,,
১৪। সকাতরে ঐ কাঁদিছে ,,
১৫। ঐ রে তরী (রূপকড়া)
১৬। নিবিড় ঘন আঁধারে—নবতাল
১৭। দুয়ারে দাও মোরে—একাদশী
১৮। জননী তোমার করুণ চরণখানি—নবপঞ্চক
১৯। বিপদে মোরে রক্ষা কর—ঝম্পক
২০। জলেনি আলো অন্ধকারে—ষষ্ঠী
২১। ওহে জীবন বল্লভ—লোকসঙ্গীত (কীর্তন)

২২। প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে—লোকসঙ্গীত (বাউল)
২৩। তোমার খোলা হাওয়া— " (ভাটিয়ালী)

২. প্রেম

প্রেম সঙ্গীতের রচনাকাল রবীন্দ্রনাথের আদি যুগ থেকে শেষযুগ অবধি বিস্তৃত। গীতবিতানের তালিকায় এর সংখ্যা ৩৯৫টি। অতএব রচনার সংখ্যানুপাতে ধর্মসঙ্গীতের পরেই প্রেমসঙ্গীতের স্থান। এই পর্যায়ের গানের রচনায় ও সুরে বহুবিধ বৈচিত্র্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বৈঠকী সুর, রাগ, মিশ্ররাগ, লোকসঙ্গীতের সুর, পাশ্চাত্য সুর এবং নিজস্ব সুর বৈশিষ্ট্যে প্রেমসঙ্গীত সমৃদ্ধ।

প্রেমসঙ্গীত কাব্যধর্মী। কারণ কাব্যাংশের উপরেই এর নামকরণের তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম, প্রকৃতি, ইত্যাদি পর্যায়ের আভাস এই প্রেমসঙ্গীতে পাওয়া যায়। যেমন—

১। এমন দিনে তারে বলা যায়
২। আজি বর্ষণ মন্দ্রিত অন্ধকারে
৩। হে নিরুপমা
৪। ওগো কিশোর আজি
৫। ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে
৬। আমি তোমার প্রেমে হব

এবার প্রেমসঙ্গীতের কয়েকটি বিশিষ্ট সুরের ও তালের রচনা দেওয়া গেল :

১। চিত্ত পিপাসিত রে—রাগসঙ্গীত
২। কে উঠে ডাকি— "
৩। স্বপনে দোঁহে—মিশ্ররাগ
৪। আমার প্রাণের মাঝে—লোকসঙ্গীত
৫। আনমনা, আনমনা— "
৬। বনে এমন ফুল ফুটেছে—বৈঠকী সুর
৭। ও কেন চুরি করে চায়— "

৮। নিদ্রাহারা রাতের এ গান—ষষ্ঠী
৯। ব্যাকুল বকুলের ফুলে—নবতাল
১০। কাঁপিছে দেহলতা—একাদশী

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের এবং শেষ দিকের রচনার একটি ক্রম-বিকাশের রূপ এই প্রেমসঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে তিনি 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন এবং শেষ জীবনে এই গীতিনাট্যটির পুনর্বিন্যাস ঘটে। 'মায়ার খেলা'র প্রথম প্রকাশের একটি গান ;

আমি কারেও বুঝি নে, শুধু বুঝেছি তোমারে।
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আঁধারে।
ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাই নি তো কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে—কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি।
কেবল তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে।

শেষ জীবনের 'মায়ার খেলার' এই গানটি পুনর্লিখিত হয়ে রূপ নিল :

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারি নি।
দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে ॥
শুভখণে কাছে ডাকিলে,
লজ্জা আমার ঢাকিলে গো,
তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে ॥
কে মোরে ফিরাবে অনাদরে,
কে মোরে ডাকিবে কাছে;
কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে,
এ নিরন্তর সংশয়ে হায় পারি নে যুঝিতে—
আমি তোমারেই শুধু পেরেছি বুঝিতে ॥

একই গানের প্রথম ও শেষ জীবনের দুটি রচনায় আঙ্গিক ও সুরের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়।

৩. স্বদেশ

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সঙ্গীত রচনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ১৩১২ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি স্বদেশ-সঙ্গীত রচনা করেন। অর্থাৎ এই বছরেই স্বদেশ-সঙ্গীতের রচনা সর্বাধিক। ১৩১২ সালের পূর্বের গানগুলি রাগসম্মত ধ্রুপদাঙ্গের। কিন্তু সাধারণের গাইবার সুবিধার জন্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে স্বদেশ-সঙ্গীতগুলিতে লোক সঙ্গীতের সুর যোজিত হয়। স্বদেশ-সঙ্গীতের রচনা-সংখ্যা ৫৭ এবং রচনাকাল প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে সীমাবদ্ধ।

আমাদের ভারতবর্ষে 'জাতীয় সঙ্গীত' হিসাবে দুটি গান গৃহীত হয়েছে। এবং এই গান দুটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যোগ আছে।

'জনগণমন' গানটি ১৩১৮ সালে মাঘোৎসবের জন্য প্রথম রচিত হয়। ১৩৫৪ সালে স্বাধীনতার পর গানটির প্রথম স্তবক জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। বলা বাহুল্য এটির সুর রবীন্দ্রনাথের। এই গানটির সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ যোগ।

বর্তমানে এই গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে বহুল প্রচলিত। পরিবেশন করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এক মিনিটের মধ্যে গানটি একটানা গেয়ে অথবা বাজিয়ে শেষ করা যায়। মনে রাখতে হবে এক মিনিটের বেশী বা কম হলে চলবে না। অতএব সেই হিসাব করে গানের লয় বাঁধতে হবে।

অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে গানটি পরিবেশন বা শ্রবণ করতে হয়। মনে রাখতে হবে, জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে দেশের এবং কবির মর্যাদা জড়িত। এ বিষয়ে শিল্পী এবং শ্রোতাদের বিশেষ সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উচ্চারণের অশুদ্ধতা কোনমতেই মার্জনীয় নয়। আমরা বলি 'পাঞ্জাব' এবং 'মারাঠা'। কিন্তু কথা দুটির শুদ্ধ উচ্চারণ 'পঞ্জাব' এবং 'মরাঠা'

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উধৃত করি—" 'জনগণ' গান যখন লিখেছিলুম তখন 'মারাঠা' বানান করি নি। 'মারাঠা'রাও প্রথম বর্ণে আকার দেয় না। আমার ছিল 'মরাঠা'। তারপর যাঁরা শোধন করেছেন তাঁরাই নিরাকারকে সাকার করে তুলেছিলেন, আমার চোখে পড়ে নি।" (রবীন্দ্র রচনাবলী ২১, পৃ. ৪১৪)

'বন্দেমাতরম' জাতীয় সঙ্গীতটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ একটা যোগ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনাটিতে ১২৯২ সালে কবি সুর-যোজনা করেন এবং ১৩০৩ সালে কংগ্রেসে স্বয়ং গানটি পরিবেশন করেন। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের আংশিক সুর দেওয়া গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নির্দিষ্ট আছে।

স্বদেশ-সঙ্গীতের কয়েকটি গানের উদাহরণ—

১। ও আমার দেশের মাটি
২। ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
৩। এ ভারতে রাখো
৪। আমরা মিলেছি আজ

৪. প্রকৃতি

এই পর্যায়ের বেশির ভাগ রচনা ক্রমবিকাশের তৃতীয় ও শেষ যুগে। ১৩০৮ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার আগে খাঁটি ঋতু সঙ্গীতের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, মাত্র ১২টি—তার মধ্যে ৭টি বর্ষার, ৩টি বসন্তের ও ১টি শরতের, বাকি গানটি এই তিনটি ঋতুর বন্দনায় রচিত 'বিশ্ববীণা রবে'।

শান্তিনিকেতন-আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ ঋতু-উৎসবের প্রবর্তন করেন। শোনা যায় আমাদের দেশে পুরাকালে আশ্রমে

ঋতু-উৎসবের আয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথ পুনরুদ্ধার করলেন সেই উৎসবের।

নতুন নতুন গান রচিত হতে লাগলো। নব নব উৎসবের আয়োজন হল। ঋতুরঙ্গ, বর্ষামঙ্গল, শ্রাবণ গাথা, শেষ বর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব ইত্যাদি গীতিনাট্যগুলি ঋতু-উৎসবে রবীন্দ্রসঙ্গীতে সমৃদ্ধ।

প্রকৃতি পর্যায়ে সাতটি উপপর্যায় আছে, সেগুলি হল—সাধারণ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, ও বসন্ত। এই উপপর্যায়ে বর্ষার গান সংখ্যায় সর্বাধিক, সংখ্যানুপাতে বসন্ত দ্বিতীয়। প্রতিটি উপ-পর্যায়ের একটি করে গান উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া গেল—

১। আজ তালের বনে করতালি—সাধারণ

২। নাই রস নাই—গ্রীষ্ম

৩। আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে—বর্ষা

৪। অমল ধবল পালে লেগেছে—শরৎ

৫। হায় হেমন্তলক্ষ্মী—হেমন্ত

৬। শীতের হাওয়ার লাগল নাচন—শীত

৭। ওগো দখিন হাওয়া—বসন্ত

৫. আনুষ্ঠানিক

আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের বেশির ভাগ রচনা বিবাহ-উৎসবের জন্য। তাছাড়া অন্যান্য রচনাও নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই রচিত :

১। সাধারণ	সবারে করি আহ্বান
	সফল করো হে প্রভু
২। জন্মদিনের গান	হে নূতন দেখা দিক
	ঐ মহামানব আসে
৩। বিবাহ উৎসবের গান	সুমঙ্গলী বধূ
	দুইটি হৃদয়ে একটি আসন
৪। মৃত্যুদিনের গান	সমুখে শান্তি পারাবার
	দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে

৫।	বৃক্ষ রোপণের গান	মরু-বিজয়ের কেতন উড়াও আয় আমাদের অঙ্গনে
৬।	হলকর্ষনের গান	আমরা চাষ করি আনন্দে ফিরে চল মাটির টানে
৭।	ফসল কাটার গান	আয়রে মোরা ফসল কাটি এলো যে শীতের বেলা
৮।	শিল্পোৎসবের গান	নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র কঠিন লোহা ছিল কঠিন ঘুমে

৬. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

প্রাচীন পদকর্তাদের অনুসরণ করে ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ যে সব পদ রচনা করেন তাকেই আমরা বলি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।'

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সংকলিত প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ পদাবলী রচনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

এ সম্বন্ধে একটি কৌতুককর ঘটনার কথা জীবনস্মৃতি থেকে উধৃত করি :

"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা স্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম ; তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে'।"

"পূর্বলিখিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম, 'সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটা জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ-নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ কাপি করিয়া আনিয়াছি।'

এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্ম ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।'···

তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম, এ লেখা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না, কারণ এ আমার লেখা। বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, 'নিতান্ত মন্দ হয় নাই'।"

ভানুসিংহের পদাবলীতে মোট ২২টি পদ আছে। তার মধ্যে নয়টি পদের সুর পাওয়া যায়, বাকি তেরোটি পদের সুর আর পাওয়া যায় না।

পদাবলীর প্রথম রচনা 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে'। রচনাকাল ১২৮৪ সাল। যে সব রচনার সুর পাওয়া যায়, তা হলো—

১। গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে

২। শুনলো শুনলো বালিকা

৩। সজনি সজনি রাধিকা লো

৪। মরণরে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান

৫। বজাওরে মোহন বাঁশী

৬। শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা

৭। আজ সখি মুহু মুহু

৮। হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে

৯। সতিমির রজনী, সচকিত সজনী

এ ছাড়া ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন—

১। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর—কবি বিদ্যাপতি

২। সুন্দরি রাধে আওয়ে বনি—কবি গোবিন্দদাস

৭. কৌতুক-গীতি

এই গানগুলির একটা মস্ত সুবিধা এই যে, ঠিকমত পরিবেশন করতে পারলে খুব সহজেই সাধারণের মন জয় করা যায়। কৌতুক ভালো

বাসে না এমন মানুষের সংখ্যা বিরল। রবীন্দ্রনাথ নিজে একজন অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় মানুষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কৌতুক-গীতির বিশেষত্ব এই যে ভাষার সরলতায় এবং সুরের চপলতায় সরস আনন্দ ও অনাবিল হাসির উদ্রেক করে। তালগুলিও খুব সহজ এবং সোজা। সাধারণের গাইতে কোন অসুবিধা হয় না।

এই পর্যায়ের অধিকাংশ রচনাই বিভিন্ন নাটকের জন্য রচিত হয়। পৃথক রচনার সংখ্যা খুব অল্প। কয়েকটি কৌতুক-গীতির একটি তালিকা দেওয়া গেলো—

১। তুমি আছ কোন পাড়া
২। সাধ করে কেন সখা ঘটাবে গেরো
৩। আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল
৪। ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী
৫। কতকাল রবে বলো ভারত হে
৬। ও ভাই কানাই
৭। মোদের কিছু নাই রে নাই
৮। কাঁটাবন বিহারিণী সুরকানা দেবী
৯। পায়ে পড়ি শোন ভাই গাইয়ে
১০। হায় হায় হায় দিন চলি যায়
১১। যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে
১২। যদি জোটে রোজ
১৩। প্রাণ নিয়ে ত সট্‌কেছি রে
১৪। অভয় দাও ত বলি
১৫। স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে
১৬। যমের দুয়ার খোলা পেয়ে
১৭। আমরা না গান গাওয়ার দল রে
১৮। প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে
১৯। ভালোমানুষ নইরে মোরা
২০। মুখের হাসি চাপলে কি হয়

এ ছাড়া 'তাসের দেশ' গীতিনাট্যের কয়েকটি রচনা কৌতুক গীতির পর্যায়ভুক্ত।

৮. তথ্য সঙ্গীত

বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ যে সব গান রচনা করেছেন তাকে আমরা বলি তথ্য সঙ্গীত।

১। ১৩২৯ সালে বর্ষামঙ্গলের সময় কবির গলা ভেঙে যায়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ ছিল তাঁর আবৃত্তি। নানাপ্রকার ওষুধ পাঁচন নিজে খাচ্ছেন অপরদেরও খাওয়াচ্ছেন। সেই ভাঙাগলায় যে গানটি রচিত হল, তা হচ্ছে,

'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে।'

২। ১৩৩৬ সালে লাহোর জেলে যতীন দাসের অনশনে মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত হল,

'সর্ব খর্বতারে দহে।'

৩। ১৩২৯ সালে শান্তিনিকেতনে নলকূপ খনন কার্যের সময় রচিত হল,

'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল।'

৪। ১৩২৯ সালে কাথিয়াবাড় ভ্রমণের সময় চাষী পরিবারের একটি মেয়েকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। তার নৃত্য পরিবেশন দেখে রচনা করলেন,

'কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে।'

৫। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে রচনা করলেন,

'মরণ সাগর পারে তোমরা অমর।'

৬। রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে রচিত হল,

'কে যায় অমৃতধাম যাত্রী।'

৭। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে রচিত হল,

'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ।'

৮। ১৩২৫ সালে বড় মেয়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে রচিত,

'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়।'

৯। নন্দিনী দেবীর উচ্চারণ যখন অস্পষ্ট ছিল তখন তাঁকে উদ্দেশ করে রচনা করলেন,

'অনেক কথা যাও যে বলে।'

এঁর উদ্দেশে আর একটি গান,

'তুমি উষার সোনার বিন্দু।'

১০। দিনেন্দ্রনাথের পোষা হরিণ পালিয়ে যাওয়ায় রচিত হল,

'সে কোন বনের হরিণ।'

১১। ১৩২৯ সালে গার্ল গাইডের জন্য রচিত হয়,

'অগ্নিশিখা এসো এসো।'

১২। ১৩৩৭ সালে জাপানী যুযুৎসুবিদ 'টাকাগাকী'র প্রদর্শনী'র উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে রচিত হয়,

'সংকোচের বিহ্বলতা।'

১৩। বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনে বরোদারাজ গায়কোবাড়ের অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে রচিত,

'বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন।'

১৪। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রচিত হয়,

'শান্তিমন্দির পুণ্য অঙ্গন।'

১৫। ১৩৪৭ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান উপলক্ষ্যে রচিত হয়,

'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ।'

১৬। প্রবাসী পত্রিকার ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে রচিত,

(১) 'পরবাসী চলে এসো ঘরে,' (২) 'এসো প্রাণের উৎসবে।'

১৭। অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের ছবি দেখে দুটি গান রচনা করেন।

(১) 'একলা বসে একে একে,' (২) 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে।'

১৮। ১৩৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোরের কুচকাওয়াজের উপযোগী করে রচিত,

'চলো যাই চলো।'

১৯। শান্তিনিকেতনে নলকূপে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন যে বাঙালী ব্যবসায়ীটি তাঁকে অভিনন্দিত করে একটি সভায় রচিত হল

'হে আকাশ বিহারী নীরদ বাহন জল।'

২০। নন্দলাল বসুর একটি ছবি দেখে লেখা

'নিভৃত প্রাণের দেবতা।'

২১। স্ত্রীর মৃত্যুর পর লেখা,

'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু।'

২২। গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করলেন রবীন্দ্রনাথের হাতে জল পান করে, এই সময় যে গান রচিত হল তা হচ্ছে,

'জীবন যখন শুকায়ে যায়।'

২৩। ১৩২৮ সালে শ্রীনিকেতনের গোড়াপত্তনের সময় কর্মী ও ছাত্রদের একত্রে গাইবার জন্যে রচিত হল,

'ফিরে চল মাটির টানে।'

২৪। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের একত্রে গাইবার জন্য রচিত হল,

'আমাদের শান্তিনিকেতন।'

২৫। ১৩৩১ সালে দোল পূর্ণিমায় শান্তিনিকেতন-আম্রকুঞ্জে উৎসব হবার কথা ছিল। বিকাল বেলা এলো তুমুল ঝড় বৃষ্টি। নন্দলাল বসু ও সুরেন কর মহাশয় কর্তৃক বিচিত্র সাজে সজ্জিত আম্রকুঞ্জ একেবারে ওলট পালট হয়ে গেলো। এই উপলক্ষে কবি রচনা করলেন,

'রুদ্রবেশে কেমন খেলা।'

২৬। আর একটি গান তথ্য সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করা যায়, সে গানটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন, "পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়মে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সবকটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

"গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।"

গানটি হল,

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।'

৯. কাব্যসঙ্গীত

এমন কতকগুলি গান আছে যেগুলি প্রথমে কবিতা হিসাবে রচিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ পরে সুরসংযোজনা করে তাঁর সঙ্গীতের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। এইসব গানগুলিকে আমরা বলি কাব্যসঙ্গীত। কাব্যসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বড় কবিতায় তাঁর আগে বাঙলাদেশে আর কেউ সুরযোজনা করেন নি।

নীচে কয়েকটি কাব্যসঙ্গীতের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

১। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর ৭টি গান
২। এ শুধু অলস মায়া—কড়ি ও কোমল
৩। কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া—মানসী
৪। ওগো শেফালি বনের মনের কামনা
৫। এই ত ভালো লেগেছিল
৬। নহ মাতা, নহ কন্যা—চিত্রা
৭। ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে—কল্পনা
৮। যাবই আমি যাবই—ক্ষণিকা
৯। নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে—ক্ষণিকা
১০। হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে—"
১১। হে নিরুপমা— "
১২। কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি—"
১৩। ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে—"
১৪। আজ বরষার রূপ হেরি—গীতাঞ্জলি

১৫। আমার গোধূলি লগন—খেয়া

১৬। হে মোর চিত্ত পূণ্যতীর্থে—গীতাঞ্জলি

১৭। যেথায় থাকে সবার অধম—গীতাঞ্জলি

১৮। তুমি কি কেবলি ছবি—বলাকা

১৯। আন্‌মনা, আন্‌মনা—পূরবী

২০। তোমার কটিতটের ধটি—শিশু

২১। আজি এ নিরালাকুঞ্জে—মহুয়া

২২। আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা—"

২৩। প্রাঙ্গণে মোর শিরিশ শাখায়—"

২৪। ওগো কিশোর আজি (১৩৩৪ সালে ঋতুরঙ্গ)

(১৩৩৪ সালে ঋতুরঙ্গ গীতিনাট্য আবৃত্তি করেন এবং সুর দেন ১৩৪৫ সালে। তাঁর যাবতীয় গানের মধ্যে ২৪ সংখ্যক গানটি পংক্তি হিসাবে সবচেয়ে বড়ো)

'ঐ আসে ঐ অতি' এবং 'হৃদয় আমার নাচেরে' কবিতার যে অংশে সুর দেওয়া হয় নি, সঙ্গীত পরিবেশনকালে সেই অংশটুকু আবৃত্তি করা যেতে পারে।

১০. শিশু সঙ্গীত

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের আগে শিশুদের জন্য পূর্ণাঙ্গ গান বা কাব্য কিছুই ছিল না। যা ছিল তা ছেলে ভুলানো ছড়া অথবা ঘুমপাড়ানি গান ইত্যাদি। শিশুদরদী রবীন্দ্রনাথ তাদের জন্য রচনা করলেন, 'শিশু' 'শিশু ভোলানাথ,' কাব্যগ্রন্থ দুটি। তাছাড়া সহজ সুরে সোজা তালে শিশুদের জন্য গান রচনা করলেন প্রায় একশোর বেশি। 'কালমৃগয়া', 'শারদোৎসব' ইত্যাদি গীতিনাট্যগুলি তাদেরই জন্য রচিত। কয়েকটি শিশুসঙ্গীতের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

১। হেদে গো নন্দরাণী

২। মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

৩। মাধবী হঠাৎ কোথা হতে

৪। নূপুর বেজে যায় রিনিঝিনি

৫। ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী
৬। তোরা যে যা বলিস ভাই
৭। ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে
৮। বাদল মেঘে মাদল বাজে

রবীন্দ্রসঙ্গীতে রূপান্তর

একই সুরে রবীন্দ্রনাথের একাধিক গান আছে। এবং সেই গানগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ গানই বিভিন্ন নাটকের জন্য রূপান্তরিত করা হয়। তার একটি তালিকা দেওয়া গেল ঃ

১।	'চলে ছলো ছলো নদীধারা'	'দেখো দেখো শুকতারা'
২।	'কোন দেবতা সে'	দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে
৩।	'বাকি আমি রাখবো না'	'আমার এই রিক্ত ডালি
৪।	দেখায় না দেখায় মেশা'	'স্বপ্নমদির নেশায়'
৫।	'বসন্তে ফুল গাঁথল'	'অশান্তি আজ হানল'
৬।	'যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়'	'ধরা সে যে দেয় নাই'
৭।	'হাসি কেন নাই ও নয়নে'	'সমুখেতে বহিছে তটিনী"
৮।	'স্বপন লোকের বিদেশিনী'	'অনেক দিনের মনের মানুষ'
৯।	'হৃদয় মোর কোমল অতি'	'আঁধার শাখা উজল করি'

কয়েকটি গানের কথা সামান্য পরিবর্তন করে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

বসন্তের 'বাকি আমি রাখবো না' গানটির সঞ্চারী 'দখিন সাগর' কথাটি 'পূরব সাগর' পরিবর্তন করে বর্ষার গান করা হয়েছে। 'চৈত্র পবনে মম চিত্তবনে' গানটির আরম্ভে 'উতল পবনে মম কুঞ্জবনে' এই সামান্য পরিবর্তন করে রূপান্তরিত হয়েছে। ঠিক এইভাবে 'ওরে কি শুনেছিস্' নটীর পূজার গানটি 'ওরে কি অপরূপ রূপ দেখরে' পরিবর্তিত হয়ে বিবাহসঙ্গীত হয়েছে। এইভাবে পরিবর্তিত হয়ে 'সার্থক কর সাধন' একবার ধর্মসঙ্গীত ও একবার বিবাহসঙ্গীত হয়েছে। 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন' 'বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন' 'শান্তিমন্দির পুণ্য অঙ্গন'

সবশেষে 'বিশ্ব বিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ' এইভাবে রূপান্তর লাভ করেছে। ১৩৩১ 'সালে সাত ভাই চম্পা' ছবি দেখে রচিত হল—

'ওগো বধূসুন্দরী
নব মধুমঞ্জরী
সাত ভাই চম্পার লহ অভিনন্দন
পর্ণের পাত্রে,
ফাল্গুন রাত্রে
স্বর্ণের বর্ণের ছন্দের বন্ধন'

১৩৪০ সালে সুর দেবার সময় এটি দাঁড়ালো বিবাহসঙ্গীত রূপে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে।

ওগো বধূ সুন্দরী
তুমি মধুমঞ্জরী,
পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুন রাত্রে
মুকুলিত মল্লিকা-মাল্যের বন্ধন।'

তাছাড়া 'তুমি তৃষ্ণার শান্তি' বর্ষাসঙ্গীত সামান্য পরিবর্তিত হয়ে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে যোজিত হয়েছে। 'হৃদয় আমার ঐ বুঝি' প্রকৃতি পর্যায়ের গ্রীষ্মের গান পরিবর্তিত হয়ে পাওয়া গেল বসন্তের গান। 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' এবং 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর' অথবা 'বিশ্ব-বীণারবে' এবং 'বিশ্বরাজালয়ে', 'ঐ ঝঞ্চার ঝংকারে ঝংকারে' এবং 'ঐ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে', 'পোহাল পোহাল বিভাবরী' এবং 'আহা জাগি পোহাল বিভাবরী' 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' 'মাটি তোদের ডাক দিয়েছে' গানগুলির কাব্যাংশের সামান্য পরিবর্তনে পৃথক রচনা বলে মনে হয়।

উচ্চারণ

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে শুদ্ধ উচ্চারণ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। গায়কীর অনেকখানি নির্ভর করে উচ্চারণ প্রণালীর উপর।

অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের অল্পবয়স থেকে এ বিষয়ে সজাগ ও সচেতন করে দিলে পরিণত বয়সে তাদের আর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। এবং লেখাপড়া শেখানোর শুরু থেকেই শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত।

মনে রাখতে হবে শুদ্ধ উচ্চারণ শুধু সঙ্গীতে নয়—আবৃত্তিতে, বক্তৃতায় সাফল্যলাভ করবার একটি প্রাথমিক ও প্রধান অঙ্গ। এবং সাংস্কৃতিক মনোভাবের পরিচায়ক।

উচ্চারণ শুদ্ধ করবার একমাত্র উপায় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কিছু পাঠ করা। যে কোনো বইয়ের কাব্যাংশ বা গদ্যাংশ শিক্ষার্থীরা পড়ে শোনাবে তাদের অভিভাবক বা শিক্ষকদের কাছে। পাঠের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট করে উচ্চারণ হচ্ছে কি না। এমন কি দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলনে ঠিকমত থামছে কি না।

শ্বাস ফুরিয়ে আসবার সময় কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক, অতএব শ্বাস থাকতে থাকতেই আবার নিশ্বাস নিতে হবে। কিন্তু যেখানে-সেখানে নয়। কাব্যের অর্থ যথাসম্ভব রক্ষা করে শ্বাসগ্রহণ অভ্যাস করতে হবে।

আরো ভালো হবে যদি শ্বাসগ্রহণের জায়গাগুলো আগে থেকে চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়। একটা কথা মনে রাখতে হবে— সঙ্গীত পরিবেশনের সময় শ্বাস যত কম নেওয়া যায় ততই ভালো। এবং অল্পসময়ের মধ্যে বেশি শ্বাস নেওয়া অভ্যাস করতে হবে।

শ্বাস নেবার পর প্রথম কথাতে ঝোঁক পড়া স্বাভাবিক। শিক্ষার্থীদের সে বিষয়ে সজাগ করে দিলে তারা এটিও অল্প বয়সেই কাটিয়ে উঠতে পারবে।

আর একটা বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই শ্বাসগ্রহণের সময় যেন কোনোরকম শব্দের না সৃষ্টি হয়। সঙ্গীত পরিবেশনকালে শ্বাসগ্রহণের শব্দ শুধু অশোভন নয়, নিন্দনীয়ও।

শ্বাসের সময় কাল যাতে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ গান গাইবার সময় যাতে

ঘন ঘন নিশ্বাস নেওয়া না হয় তার জন্যে স্বরসাধনের সময় থেকেই কতকগুলি নিয়ম অভ্যাস করতে হয়।

আগেই বলেছি, পাঠাভ্যাসের সময় শ্বাসগ্রহণের জায়গাগুলো চিহ্ন দিয়ে রাখলে ভালো হয়। তেমনি সঙ্গীত পরিবেশনের সময়ও এই প্রথা অবলম্বন করলে অনেক ভালো ফল পাওয়া যাবে।

শ্বাস নেবার সময় সুরের মধ্যে সামান্য ছেদ পড়বে, এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই বিরাম বা ছেদগুলি সঙ্গীতের কাব্যাংশের অর্থকে যেন ক্ষুণ্ণ না করে। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক—

আমার সকল × দুখের প্রদীপ × জ্বেলে দিবস × গেলে করব নিবেদন।

আমি শ্বাস নেবার জায়গাগুলি (×) এই চিহ্ন দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি। অর্থাৎ শ্বাস যদি নিতেই হয় তাহলে × এই চিহ্নের স্থানগুলিতে সুরের ক্ষণিক বিরাম দিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এবং তাতে কাব্যাংশের অর্থ ক্ষুণ্ণ হবার ভয় নেই। কিন্তু বিরামের জায়গাগুলো একটু অদল বদল করলে কি হয় দেখা যাক্।

আমার সকল × দুখের প্রদীপ × জ্বেলে দিবস × গেলে করব নিবেদন।

এতে গানের অর্থ যে কত নিরর্থক হয়ে পড়ে সে কথা বোধকরি পরিষ্কার করে বলবার দরকার হবে না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে কাব্যকে যথার্থ মূল্য দিতে হবে। সুরের মত তারও একটা মর্যাদা আছে একথা আমরা যেন ভুলে না যাই।

এই সঙ্গে আরো একটা কথা জানিয়ে রাখি, সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনের সময়ও যদি এই রীতি পালন করা যায় তাহলে পরিবেশনের মান অনেক উন্নত হবে। প্রত্যেকে যাতে একই স্থানে এবং একই সময়ের মধ্যে শ্বাসগ্রহণ অভ্যাস করতে পারে সে বিষয়ে পরিচালকের নির্দেশ থাকলে সমবেত সঙ্গীতগুলি শুনতে খুব ভালো লাগবে। একথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি।

শব্দতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে 'হর' এবং 'হরি' শব্দের 'হ' উচ্চারণ

বিভিন্ন। 'হরি'র 'হ' যেভাবে উচ্চারণ হয় তাকে আমরা বলি হ্রস্ব ও। এর উচ্চারণ পদ্ধতি শুদ্ধ অ এবং শুদ্ধ ও'র মাঝামাঝি।

'এ' বর্ণটি সাধারণত দুভাবে উচ্চারিত হয়। শুদ্ধ ও বিকৃত। 'জেনো' ও 'যেন' উচ্চারণ বিভিন্ন। প্রথমটি শুদ্ধ এ এবং দ্বিতীয়টি বিকৃত এ অর্থাৎ 'এ্যা।' এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি নির্দেশ আছে। শুদ্ধ এ যেখানে উচ্চারণ হবে সেখানে মাত্রা বিহীন 'ে' একার ব্যবহার করা হয় এবং বিকৃত একার অর্থাৎ 'এ্যা' কার উচ্চারণের 'ে' মাত্রা একার ব্যবহার করা হয়।

বিশ্বভারতী প্রকাশিত গীতবিতান এবং রচনাবলীতে তাদের ব্যবহার দেখা যায়। যথা—

মিলনরাতি পোহালো × বাতি নেভার বেলা এল
ফুলের পালা ফুরালে × ডালা উজাড় করে ফেলো

গানটির প্রথম ছত্রে 'নেবার' (এ) 'বেলা' (এ্যা) দুটি একারে দুরকম চিহ্ন লক্ষণীয়। দ্বিতীয় ছত্রে 'ডালা উজাড় করে ফেলো (এ), ফ্যালো নয়।

'এ' বর্ণ দিয়ে আরম্ভ কয়েকটি কথার উচ্চারণ কেমন হবে তার একটা তালিকা দেওয়া গেলো—

শুদ্ধ 'এ'	বিকৃত 'এ'
এই	এক
একক	একলা
একাকী	একেলা
একত্র	একা
একান্ত	একাদশী
একদা	এখন
একটি একটু, একটুকু	এমন
এখনি	একাকার
এমনি	একটা

ঐ বর্ণটি শুদ্ধ 'ও' এবং 'ই' র মিলিত উচ্চারণ হবে যেমন বৈশাখ—বোইশাখ। বইশাখ নয়। তেমনি 'ঔ' বর্ণটি শুদ্ধ 'ও' এবং 'উ'র মিলিত উচ্চারণ।

সৌরভ—সোউরভ। সউরভ নয়।

হসন্ত যুক্ত শব্দগুলো ঠিকমত উচ্চারণ করা দরকার। এই শব্দগুলো মৃদুস্বরে অথচ স্পষ্ট করে উচ্চারিত হবে। যেমন—তোমার, আকাশ, আমায়। প্রতিটি শব্দের শেষে যে হসন্ত বর্ণগুলি আছে র্, শ্, য়্, এগুলি মৃদুস্বরে উচ্চারিত হলেও স্পষ্ট করতে হবে।

বাংলার আর একটি শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি উধৃত করি। এই চিঠিখানি তিনি লিখেছিলেন কবি দিলীপকুমার রায়কে।

"তুমি যে 'ম্লান' শব্দটিকে হসন্তভাবে উচ্চারণ করো এ আমার কাছে নতুন লাগলো। আমি কখনই 'ম্লান্' বলিনে।···ওটা অতি সুন্দর শব্দ, ওকে বিনাদোষে জরিমানা করে ওর স্বর হরণ কোরো না, তোমার কাছে এই আমার দরবার।"

নিয়মিত অভ্যাস করলেই এসব ত্রুটি নিশ্চয়ই সংশোধন করা যাবে। তবে এই চেষ্টা 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' বয়স থেকে সুরু করাই ভালো। তা না-হলে যদি 'জল পরে, পাতা নরে' চলতে থাকে তাহলে 'নৈব নৈব চ'। রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার ইতি ঐখানেই, একথা যেন মনে রাখি।

তৃতীয় অধ্যায়

সুর ও স্বরলিপি

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে যে সব সুর ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মোটামুটিভাবে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ১. রাগসঙ্গীত, ২. লোক সঙ্গীত, ৩. পাশ্চাত্য সুরের গান, ৪. নিজস্ব সুর বৈশিষ্ট্য

রাগসঙ্গীত

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশে দেখা যায় যে রাগসঙ্গীত বা হিন্দিভাঙা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রচনা প্রথম দুটি যুগে সীমাবদ্ধ। রাগসঙ্গীত পর্যায়কে ৫টি উপপর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। সেগুলি হলো ১. খেয়ালাঙ্গ ২. ঠুংরী, ৩. তারানা, ৪. ধ্রুপদাঙ্গ, ৫. টপ্পা।

১. খেয়ালাঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলা দেশে আমার নামে অনেক প্রবাদ প্রচলিত, তারই অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে আমি হিন্দুস্থানী গান জানিনে বুঝিনে। আমার আদি যুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুব পদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাক্‌বিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সঙ্গীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনে; সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি, এ কথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত জানে না।"

খেয়ালের আলোচনার প্রথমেই মনে রাখতে হবে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মত রবীন্দ্রসঙ্গীতে তানের ব্যবহার একেবারে অচল। তার কারণ, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সুরপ্রধান। সেখানে তান বোলতানের ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত, হিন্দিভাঙা হলেও, তার কাব্যাংশের

যথেষ্ট মূল্য আছে এবং তানের ব্যবহারে তা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনও কাউকে তান দিয়ে তাঁর খেয়ালঙ্গ গান শেখান নি বা শোনান নি।

তৎকালীন কয়েকজন সঙ্গীতগুণী তাঁর হিন্দিভাঙা খেয়াল গান তান দিয়ে তাঁর সামনে গেয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাতে কোনো আপত্তি করেন নি। অতএব 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্' মনে করে তানের প্রচলন করলে অন্যায় হবে। ক্ষেত্রবিশেষে দু একটা পূর্ব নজির যা দেখানো হয়, রীতি হিসাবে তা গ্রহণ করা চলে না।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা উদ্ধৃতি দিলে বক্তব্য পরিষ্কার হবে বলে মনে করি—

রবীন্দ্রনাথ কবি দিলীপ রায়কে বলছেন, "আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে— এ কথাটা কেন তুমি স্বীকার করতে চাও না? তুমি কেন স্বীকার করবে না যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সুর মুক্তপুরুষ ভাবে আপন মহিমা প্রকাশ করে? কথাকে সরিক বলে মানতে সে নারাজ। বাংলার সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়। সে যুগল মিলনের পক্ষপাতী······আধুনিক বাংলা সঙ্গীতের বিকাশ ত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারায় হয় নি। আমিও সে দাবী করছি না। আমার আধুনিক গানকে সঙ্গীতের একটা বিশেষ মহলে বসিয়ে তাকে একটা বিশেষ নাম দাও না, আপত্তি কি। বটগাছের বিশেষত্ব তার ডাল আবডালের বহুল বিস্তারে। তালগাছের বিশেষত্ব তার সরলতার ও শাখা পল্লবের বিরলতায়। বটগাছের আদর্শে তাল গাছকে বিচার কোরো না। বস্তুতঃ তাল গাছ হঠাৎ বটগাছের মত ব্যবহার করতে গেলে কুশ্রী হয়ে ওঠে।...

"তুমি কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি ভাবে গাইবে? আমি তো নিজের রচনাকে সে রকমভাবে খণ্ড বিখণ্ড করতে অনুমতি দিই নি।...

"হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতকার তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা চেয়েছিলেন। তাই কোনো দরবারী কানাড়ায় খেয়াল সাদামাটা ভাবে গেয়ে গেলে সেটা নেড়া নেড়া না শুনিয়েই পারে না। কারণ দরবারী কানাড়া তানালাপের সঙ্গেই গেয়। সাদামাটা ভাবে গেয় নয়। কিন্তু আমার গানে তো আমি সে রকম ফাঁক রাখি নি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।…"

অতএব দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান বাট বোলতান ইত্যাদি সর্বসময়ে পরিত্যাজ্য।

ভারতীয় রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানা যাক্—

"পূরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য আর ভৈরোঁতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন?… প্রথমত প্রভাতের রাগিণী ও সন্ধ্যার রাগিণী উভয়েতেই কোমল সুরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশ নয়ন নিমীলত করে।…তবে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কি বিষয়ে প্রভেদ থাকা উচিত? না, একটাতে সুরের ক্রমশ উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়া আবশ্যক, আর একটাতে অতি ধীরে ধীরে সুরের ক্রমশ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক। ভৈরোঁ ও পূরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে। এইজন্যেই প্রভাত ও সন্ধ্যা দুই রাগিণীতে মূর্তিমান।"

"সানাইয়েতে ভৈরবী বাজাচ্ছিল, এমনি অতিরিক্ত মিষ্টি লাগছিল যে সে আর কি বলব—আমার চোখের সামনেকার শূন্য আকাশ এবং বাতাস পর্যন্ত একটা অন্তর্নিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে যেন স্ফীত হয়ে উঠছিল, বড়ো কাতর কিন্তু বড়ো সুন্দর…"

"ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহ-ব্যাকুলতা। ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা।"

"ভৈরোঁ যেন ভোরবেলাকার আকাশেরই প্রথম জাগরণ।"

"মেঘমল্লার যেন অশ্রু গঙ্গোত্রীর কোন্ আদি নির্ঝরের কলকল্লোল।"

"আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লারে জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।"

"বাতাসে ভূপালীর সুরে একটা ডাক শুনতে পাচ্ছি। থাম্ রে থাম্, আয় রে আয়।"

"সব যায়, চলে যায়। আমরাও যাই, এই বিষাদের ছায়ায় সর্বত্র একটি করুণা মাখিয়ে দিয়েছে চারিদিকে পূরবী রাগিণীর কোমল সুরগুলি বাজিয়ে তুলে আমাদের মনকে আর্দ্র করেছে।"

"পূরবী যেন শূন্য গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।"

"মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিশ্বাস।"

"আজকের এই দিনটা সেই রকমের— এ আছে তবু নেই···এ গৌরসারঙের আলাপ, যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন হিসাবের খাতায় কোনো অঙ্ক রেখে যাবে না।"

"পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা।"

"সাহানার সুর অচঞ্চল ও গম্ভীর, যাতে আমোদ আহ্লাদের উল্লাস নেই তাই আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিণী।"

"কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি।"

"খাম্বাজের করুণ তান সহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।"

মূল গান সহ কয়েকটি খেয়ালাঙ্গ গানের নমুনা দেওয়া গেল—

১। আঁখিজল মুছাইলে—জিন ছুঁয়ো মোরে—রামকেলি, ত্রিতাল
২। আজ বুঝি আইল—ফুল রহি কলিয়াঁ—সাহানা, ত্রিতাল
৩। আজি মম জীবনে—অব মোরি পায়েলা বাজনু—আড়ানা, ত্রিতাল
৪। আনন্দ ধারা বহিছে—লাগি মোরে ঠুমক্—মালকোশ, ত্রিতাল
৫। মন জাগো মঙ্গললোকে—জাগো মোহন প্যারে—ভৈরব, ত্রিতাল
৬। নাথ হে প্রেমপথে—বল্মা রে চুনরিয়া—সুহাকানাড়া, ত্রিতাল

৭। ডাকো মোরে আজি—পরজ, ত্রিতাল

৮। তিমির বিভাবরী—ক্যায়সে কাটোঙ্গি—বেহাগ, ত্রিতাল

৯। আজি কমল মুকুলদল—মনকী কমলদল—মিশ্রবাহার, ত্রিতাল

১০। রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে—মুরলিয়া ইহ ন বজাও—খাম্বাজ, ত্রিতাল

সেতারের গৎ-ভাঙা দুইটি গান—

১। এসো শ্যামল সুন্দর—দেশ, ত্রিতাল

২। মোর ভাবনারে কি হাওয়ায়—দেশ, ত্রিতাল

২. ঠুংরী

রবীন্দ্রনাথের ঠুংরীভাঙা গানের সংখ্যা খুব অল্প—

১। তুমি কিছু দিয়ে যাও—কৈ কুছু কহরে

২। খেলার সাথী বিদায় দ্বার—মহারাজ কেবড়িয়া

স্বতন্ত্র রচনা হিসাবে বলা যেতে পারে—

১। কখন দিলে পরায়ে

২। কী সুর বাজে, আমার প্রাণে

৩. তারানা

ঠুংরীর মত তারানা সুরের ভাঙা গানের সংখ্যা খুব কম—

১। সুখহীন নিশিদিন—দারা দীম দারা দীম—নটমল্লার, ত্রিতাল

২। ঐ পোহাইল তিমির রাত্রি—তোম তানা নানা নানা
আলাহিয়া, ত্রিতাল

৩। অহো আস্পর্ধা এ কি – দারা দ্রিম তা না—বেহাগ, ত্রিতাল

৪। চরাচর সকলি মিছে মায়া—দারা দ্রিম তানা নানা—বেহাগ, ত্রিতাল

৪. ধ্রুপদাঙ্গ

ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মত দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ লয়ের কৌশল দেখানোর রীতি নেই। কারণ, তার ফলে কাব্যাংশের এমন সব কথার উপর মৃদঙ্গের ঝোঁক পড়ে যাতে অর্থ ও ভাব ক্ষুন্ন হতে পারে।

মূলগানসহ ধ্রুপদাঙ্গ গানের কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল—

১। আজি বহিছে বসন্ত পবন—আজু বহত সুগন্ধ পবন—বাহার, তেওড়া

২। প্রথম আদি তব শক্তি—প্রথম আদি শিবশক্তি—
দীপক পঞ্চম, সুরফাঁকতাল

৩। বাণী তব ধায়—বেণী নিরখত ভূজঙ্গ—আড়ানা, চৌতাল

৪। পান্থ এখনো কেন—রঙ্গ যুগত সেঁা—ললিত, সুর ফাঁকতাল

৫। বাজাও তুমি কবি—আয়ে ঋতুপতি—বাহার, সুরফাঁকতাল

৬। শুভ্র আসনে বিরাজ—রুদ্রদেব ত্রিনয়ন—ভৈরো, আড়াচৌতাল

৭। সুধা সাগর তীরে—আয়ো ফাগুন বঢ়োমান—নায়কী কানাড়া

৮। সুন্দর বহে আনন্দ—শঙ্কর শিব পিনাকী—ইমন কল্যান, সুরফাঁকতাল

৯। জাগে নাথ জ্যোৎস্নারাতে—আজ রঙ্গ খেলত হোরী—বেহাগ, ধামার।

১০। আজি মম মন চাহে—ফুলি বন মন মোর—বাহার, চৌতাল

স্বতন্ত্র রচনার কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল

১। অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে—তেওরা

২। হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু—তেওড়া (৩+৪)

৩। এবার নীরব করে দাও হে—বিলম্বিত ত্রিতাল

৪। গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে—রূপক্‌ড়া

৫। নিবিড় ঘন আঁধারে—নবতাল

৬। দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া—একাদশী

৭। জননী তোমার করুণ চরণখানি—নবপঞ্চক

৮। আমার প্রাণে গভীর গোপন—তেওড়া

৯। এসো হে এসো সজলঘন—ঝাঁপতাল

১০। একি সুগন্ধ হিল্লোল—ঝাঁপতাল

৫. টপ্পা

রবীন্দ্রসঙ্গীতে টপ্পার একটি বিশেষ স্থান আছে। এই গানগুলি তালের মধ্যে নিবদ্ধ না করাই ভালো। তাতে ভাব বা রূপ প্রকাশে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এবং স্বরলিপিকে অনুকরণ না করে অনুসরণ করাই ভালো। দেখা যায় এইসব সঙ্গীত পরিবেশনে শিল্পীর যথেষ্ট স্বাধীনতা

থাকে। তবে মনে রাখতে হবে স্বাধীনতা মানেই উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। ভাব ও সুরের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে টপ্পা সঙ্গীত পরিবেশন করতে হয়।

একটি বা দুটি স্বরে স্বরক্ষেপণের পুনরাবৃত্তি টপ্পা সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য তবে স্বরক্ষেপণের পুনরাবৃত্তি খুব বেশিও হবে না এবং খুব অল্পও নয়। ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। গিটকিরি খুব পরিষ্কার হবে এবং প্রয়োগ করবার সময় মৃদুস্বর ব্যবহার করতে হবে।

এইসব গানের সুষ্ঠু পরিবেশন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে শিল্পীর কাব্য ও সুর জ্ঞানের উপর। স্বরক্ষেপণের প্রয়োগ স্বরসাধন শিক্ষার সময় থেকেই হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে টপ্পা গানের সুর ঝিঁঝিট, কাফি, ভৈরবী, সিন্ধু, খাম্বাজ ইত্যাদি রাগরাগিণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

টপ্পা ভাঙা গানের কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল—

১। এ পরবাসে রবে কে—ও মিঞা বেজন্থওয়ালে—সিন্ধু
২। কে বসিলে আজি—বে পরিয়া তাঁডে—সিন্ধু
৩। দিন যায়রে দিন যায়—বেনিজা রয়ননদ—পিলু
৪। এ কি করুণা—নইরে মা বরণ—বাহার
৫। বন্ধু, রহরহ সাথে—সঙ্গে চলা, দিয়া হাওয়ে—ভৈরবী
৬। হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল—মিয়াবে মান্থলে,—ঝিঁঝিট

স্বতন্ত্র রচনার কয়েকটি নমুনা—

১। পথ চেয়ে যে কেটে গেল
২। সকল জনম ভরে
৩। আজি যে রজনী যায়
৪। সার্থক জনম আমার
৫। আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
৬। ও চাঁদ চোখের জলের
৭। তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
৮। দূরে কোথায় দূরে দূরে

৯। যা হবার তা হবে

১০। কোথা যে উধাও হল

লোকসঙ্গীত

ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাকে সাধারণভাবে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং অন্যটি লোকসঙ্গীত। এক সময়ে রাজদরবারে বা সহরের সঙ্গীতগুণীদের মহলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আদর ও প্রচলন ছিল। অপরপক্ষে লোকসঙ্গীত প্রচলিত ছিল পল্লীসমাজে বা আউল-বাউলের আখড়ায়।

এই সঙ্গীত পরিবেশনে স্বরসাধন বা শিক্ষানবীশীর প্রয়োজন হয় না। বাউল বৈরাগীর দল এইসব গান গেয়ে ভগবৎ আরাধনায় মগ্ন থাকত এবং পল্লীসমাজে আদৃত হত।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাউলদের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর সঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে লোক-সঙ্গীতের সুরের প্রভাব তাঁর সঙ্গীতে অত্যন্ত বেশি। এবং ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় যুগ থেকে শেষযুগ অবধি এই রচনাকাল বিস্তৃত।

লোক সঙ্গীতের মধ্যে আমরা পাই। ১. বাউল, ২. কীর্তন ৩. ভজন ৪. রামপ্রসাদী ৫. ভাটিয়ালী ৬. সারি ইত্যাদি গান।

বাউলের সুর

বাউল গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক্—

"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে— অন্য রাগ রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা

অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময় আমার মনের মধ্যে সহজে মিশে গেছে।"

মূলগানসহ কয়েকটি বাউল গানের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

১। আমার সোনার বাংলা—"আমি কোথায় পাব তারে"
২। যদি তোর ডাক শুনে—"হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে"
৩। এবার তোর মরা গাঙে—"মন মাঝি সামাল সামাল"

স্বতন্ত্র রচনার কয়েকটি বাউল গান—

৪। আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
৫। আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে
৬। আমি তারেই জানি তারেই জানি
৭। ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে
৮। তুমি খুশী থাক
৯। ওরে আগুন আমার ভাই
১০। যা ছিল কালো ধলো
১১। তোমার আনন্দ ওই (আখর যুক্ত বাউল)

কীর্তন

বাংলাদেশে কীর্তন গানের বিশেষ প্রচার হয় শ্রীচৈতন্যদেবের কল্যাণে। তাঁর দ্বারা দলবদ্ধভাবে প্রচলিত রাধাগোবিন্দের নাম গানকেই বলা হয় নাম-কীর্তন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবিদের কাব্য গানকে বলা হল পদাবলী-কীর্তন বা লীলাকীর্তন।

এই কীর্তনের সুর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু গানে ব্যবহার করেছেন। কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেলো।

১। আমি জেনে শুনে (আখর যুক্ত)
২। ওহে জীবন বল্লভ („)
৩। মাঝে তব দেখা পাই (,.)
৪। তবু মনে রেখো
৫। আমার মল্লিকাবনে
৬। তোমরা যা বলো

৭। ফাগুনের সুরু হতেই
৮। ওই আসনতলের মাটির পরে
৯। না চাহিলে যারে পাওয়া যায়
১০। আমি তখন ছিলেম মগন
১১। ভালবেসে সখি, নিভৃতে যতনে
১২। সুখে আছি, সুখে আছি সখা আপন মনে

ভজন সুরের গান

বাংলাদেশের বাইরে পল্লীগ্রামে ভগবৎ বিষয়ক আরাধনায় এই সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতপ্রবণ মন এই 'দেহাতি' সুর থেকেও তার মাধুর্যটুকু তাঁর সঙ্গীতে গ্রহণ করেছেন। একটি তালিকা দেওয়া গেল।

১। আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে—মহীশূরী
২। এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি—গুজরাটি
৩। এ কি লাবণ্যে—মহীশূর
। এ হরি সুন্দর—পাঞ্জাবী
৫। কোথা আজ প্রভু—গুজরাটি
৬। গগনের থালে—পাঞ্জাবী
৭। বাজে বাজে রম্যবীনা—„
৮। সকাতরে ঐ কাঁদিছে—কানাড়ী

রামপ্রসাদী সুরের গান

রবীন্দ্রসঙ্গীতে রামপ্রসাদী সুরে গানের সংখ্যা অতি অল্প। তার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

১। আমরা মিলেছি আজ
২। শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা
৩। আমি শুধু রইনু বাকি
৪। প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে
৫। একবার তোরা মা বলিয়া ডাক

সারি গানের সুর

১। আমি কান পেতে রই

২। এবার তোর মরা গাঙে

ভাটিয়ালী সুরের গান

১। গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ

২। তোমার খোলা হাওয়া

ঝুমুর সুরের গান

১। ওরে বকুল পারুল

২। পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে

৩। বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা

কথকতা সুরের গান

১। কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি

পাশ্চাত্য সুরের গান

কবি প্রথম জীবনে বিলাত-প্রবাসে কিছুকাল কাটিয়ে ছিলেন। এবং পাশ্চাত্য সুরগুলি তার মনে তখন বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু এ প্রভাব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। তাঁর ইংরেজি সুরের গানের সংখ্যা খুব কম এবং ক্রম বিকাশের প্রথম যুগেই সীমাবদ্ধ।

একটি তালিকা দেওয়া গেলো—

১। আহা, এ বসন্তে আজি —Go where glory waits the

২। ওহে দয়াময় ”

৩। মরি, ও কাহার বাছা ”

৪। মানা না মানিলি ”

৫। ও দেখবি রে ভাই—The vicar of Bray

৬। কতবার ভেবেছিনু—Drink to me only

৭। কালী কালী বলোরে আজ—Nancy Lee

৮। তবে আয় সবে আয়

৯। তুই আয়রে কাছে আয়—The British Grenadiers

১০। পুরানো সেই দিনের কথা—Auld Lang Syne
১১। ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে—The banks and braes
১২। সকলি ফুরালো—Rabin Adair

স্বতন্ত্র রচনায় পাশ্চাত্য সুরের আভাষ পাওয়া যায়

১। তোমার হল সুরু
২। আমি চিনি গো চিনি
৩। ধরা দিয়েছি গো
৪। এ মণিহার আমায় নাহি সাজে
৫। The bee is to come (ইংরাজি 'দালিয়া' নাটকের জন্য লিখিত ও সুর সংযোজিত)

নিজস্ব সুর বৈশিষ্ট্য

কয়েকটি ভাঙা গান ছাড়া রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় সঙ্গীত রচনা নিজস্ব সুর বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে তাঁর দান যেমন অমূল্য স্থানও তেমনি মর্যাদাপূর্ণ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই পর্যায়ের আলোচনায় প্রথমেই একটি গানের কথা উল্লেখ করি। 'বোলরে পাপিয়ারা' গানভাঙা 'কোথা যে উধাও হল 'এই গানটিতে আড়ানা, কাফি ও মল্লার স্বরবিন্যাসের মিশ্রণে এমন একটি সুর সৃষ্টি হয়েছে যা ভারতীয় রাগসঙ্গীতে ইতিপূর্বে আর হয় নি। গানটির রাগরূপের যে গঠন নৈপুণ্য আমরা পাই তা সত্যই অভিনব এবং অভূতপূর্ব। এই সুরটিকে 'রবিমল্লার' নামে আমরা স্বীকার করে নেব। মনে রাখতে হবে, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে, একটি একটি করে সপ্ত সারং, দ্বাদশ মল্লার ও অষ্টাদশ কানাড়া একদিন এইভাবেই সৃষ্ট হয়েছিল।

এবার কয়েকটি গানের উদাহরণ দিয়ে তাঁর সুর বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে বোঝানোর চেষ্টা করা যাক্—

'না যেও না ক' গানটিতে 'না' কথাটি সুরে যে ভাবে বসানো হয়েছে তাতে মিনতির আভাস পরিষ্কার বোঝা যাবে। 'কাছে থেকে

দূর রচিল' গানটিতে 'কাছে' এবং 'দূরে' কথা দুটিকে যেভাবে সুরে প্রয়োগ করা হয়েছে তা লক্ষ্য করলে কথার সঙ্গে সুরের মিল বোঝা যাবে। 'অনেক কথা যাও যে' বা 'অনেক পাওয়ার' গান দুটিতে 'অনেক' কথাটির মীড় লক্ষ্যনীয়। আবার 'একটুক্ ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি' গানটিতে 'একটুকু' কত ছোটকরে বলা হয়েছে। 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' গানটির মধ্যে 'খেলিয়ে গেল ঢেউ' সুরটি ঠিকমত প্রয়োগ করতে না পারলে ঢেউয়ের দোলন নষ্ট হবে। 'চরণ-ধরিতে দিও গো' গানটিতে চরণ ধরার জন্য যে অনুরোধ 'নিও না নিও না সরায়ে' তারই পরিণতি মিনতিতে। 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর' গানটিতে 'ক্ষমা কর' তিনভাবে গাইতে হয়। প্রথমে অনুরোধ, তারপর মিনতি অবশেষে ব্যাকুলতা।

দুঃখ, বেদনা, ব্যথা, ভাবগুলি প্রকাশ করতে রবীন্দ্রনাথ কোমল স্বর ব্যবহার করেছেন। সুরের নিজস্ব ভাষাকে যেন কথায় প্রকাশ করেছেন।

অন্যের রচনায় সুর সংযোজনা

নিজের রচনা ব্যতীত অপরের কয়েকটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ সুর যোজনা করেছেন। রচয়িতার নামসহ একটি তালিকা দেওয়া গেল—

১। এ ভরা বাদর, এ মাহ ভাদর—বিদ্যাপতি
২। সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি—গোবিন্দ দাস
৩। মিলে সবে ভারত সন্তান—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪। বন্দেমাতরম্ (আংশিক)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৫। বুঝতে নারি নারী কি চায়—অক্ষয়কুমার বড়াল
৬। গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে—সুকুমার রায়

এছাড়া কতকগুলি বেদমন্ত্রে ও বৌদ্ধমন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ সুর যোজনা করেছেন। নীচে তার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

বৈদিক মন্ত্র

১। য আত্মদা বলদা
২। তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্

৩। যদেমি প্রস্ফুরন্নিব

৪। শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

৫। সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্

৬। উষো বাজেন বাজিনি

৭। অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভিঃ

৮। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে

৯। ধীরা ত্বস্য মহিনা

১০। উদু ত্যং জাতবেদসম্

১১। থায়ুরনিলমমৃতমথেদম্

১২। অস্থা দেবা উদিতা সূর্যস্য

১৩। পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষম্

বৌদ্ধমন্ত্র

২। ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে—ভৈরবী

২। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং—কাফি

৩। নথিমে সরণং—মিশ্ররামকেলি

৪। নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়–বেহাগ

৫। বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো—মিশ্র রামকেলি

সুরান্তর ও ছন্দান্তর

এই পর্যায়ে এমন কতকগুলি গানের তালিকা দেওয়া হল যার কাব্যাংশ ক্ষুণ্ণ না করে বা সামান্য পরিবর্তন করে একাধিক সুর যোজিত হয়েছে এবং যার ফলে ছন্দেরও পরিবর্তন ঘটেছে। সেইজন্য ছন্দ ও লয় অধ্যায়ে'র ছন্দান্তর পর্যায়ে পুনর্মুদ্রিত করা হলো না। গানগুলি হচ্ছে—

১। দখিন হাওয়া জাগো জাগো—কাহারবা

২। আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে—ষষ্ঠী ও কাহারবা

৩। ঝড়ে যায় উড়ে যায়—কাহারবা ও একতাল

৪। শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে—কাহরবা ও চৌতাল (৪+৪+৪)

৫। কী বেদনা সে কি জান—দাদরা

৬। বসন্তে বসন্তে তোমার—দাদরা ও কাহারবা

৭। বসন্তে কি শুধু কেবল—তেওরা ও কাহরবা
৮। হে সখা, বারতা পেয়েছি—কাহরবা
৯। লক্ষ্মী যখন আসবে—ষষ্ঠী ও দাদরা
১০। ফুরোলো ফুরোলো এবার—দাদরা

স্বরলিপি

বর্তমানে 'স্বরবিতানে' যে 'আকার মাত্রিক স্বরলিপি' প্রচলিত আছে সেটি ১২৭৬ সালে রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম সূত্রপাত করেন।

এই স্বরলিপি পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রতি স্বরবিতানের প্রথমে বা শেষে মুদ্রিত আছে। প্রথম শিক্ষার্থীকে সেই নিয়মানুসারে স্বরলিপির হুবহু অনুকরণ করে সঙ্গীত শিক্ষা করতে হয়।

প্রথমে হাতে তাল ফাঁক দিয়ে স্বরলিপির স্বরগুলি যথাযথ সুরে পাঠ করতে হবে। এইখানে বলে রাখা ভালো যে স্পর্শ স্বরগুলি উচ্চারণ না করে তার সংলগ্ন স্বরটিকে স্পর্শ সুর যুক্ত করে উচ্চারণ করতে হয়।

এইভাবে স্বরলিপির স্বরগুলি সুরে অভ্যাস হয়ে গেলে গানটি তুলতে হয়। তাতে সুর নিখুঁত হবে। গানটি সম্পূর্ণ শেখা বা তোলা হয়ে গেলে এবং ভালোভাবে কণ্ঠস্থ হলে স্বরবিতান বন্ধ করে কয়েকবার গেয়ে নিয়ে ঐ গানটির একটি স্বরলিপি তৈরি করতে হবে বা লিখতে হবে। এইবার লিখিত স্বরলিপিটি মূল স্বরবিতান দেখে মিলিয়ে নিতে হবে এবং ভুল ত্রুটি থাকলে সংশোধন করে নিতে হবে।

এইভাবে নিয়মিত অভ্যাস করলে সুরটি নিখুঁতভাবে আয়ত্ব হবে।

সেইজন্য স্বরলিপি পাঠ এবং রচনা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষায়তনে অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট থাকে বা থাকা উচিত।

স্বরলিপি পাঠ করবার সময় বা গান তোলবার সময় প্রচলিত লয়কে বিলম্বিত করে নেওয়া ভালো। তাতে প্রত্যেকটি সিকিমাত্রা বা আধমাত্রা স্বর বা সুর স্পষ্ট এবং পরিষ্কার উচ্চারণ করা যাবে। এবং

সুরটি ভালো করে কণ্ঠস্থ হলে পরিবেশনের সময় নির্দিষ্ট লয়ে গানটি গাইলে সুরের দিক থেকে আর কোনো ত্রুটি থাকবে না।

এবার স্বরবিতান প্রথম খণ্ডকে পাঠ্য হিসাবে ধরে নিয়ে কয়েকটি সহজ গানের তালিকা দেওয়া গেল। পূর্বলিখিত প্রথানুযায়ী অনুশীলন করলে ফল ভালোই হবে বলে মনে করি।

১। দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
২। সে আমার গোপন কথা
৩। যৌবনসরসী নীরে
৪। পরবাসী চলে এসো ঘরে
৫। রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো
৬। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে
৭। হে নবীনা
৮। সেদিন দুজনে দুলেছিনু
৯। চেনা ফুলের গন্ধস্রোতে
১০। হৃদয়ে মন্দ্রিল

———

চতুর্থ অধ্যায়

ছন্দ ও লয়

এই অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখতে পাবো যে ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ যদি ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তাহলে গানের সময় তালের দিক থেকে আমাদের কোনো ভয় থাকবে না।

কিছুদিন পূর্বেও সাধারণের ধারণা ছিল যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বোধ হয় কোনো 'তালের বালাই' নেই। কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অনেকদিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি। এইজন্য যতই বিনয় করি না কেন এটুকু না বলিয়া পারি না যে ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি।...কাব্যে ছন্দের যে কাজ গানে তালের সেই কাজ।

"পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির মতো কাব্যে ছন্দের আবর্তনের দুটি অঙ্গ আছে। একটি বড়ো গতি, আর একটি ছোটো গতি। অর্থাৎ চাল এবং চলন। প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ।"

তালের উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যকে স্পষ্ট করা যাক্—

I ১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ ৭ ৮ | ৯ ১০ ১১ ১২ | ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ I

দেখা যাচ্ছে ১৬ মাত্রার চালটিকে প্রতি ৪ মাত্রায় দাঁড়ি দিয়ে চলন ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ ৪টি ৪ মাত্রার চলনে একটি ১৬ মাত্রার চাল সারা হচ্ছে। এই তালটির নাম ত্রিতাল।

I ১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬ | ৭ ৮ ৯ | ১০ ১১ ১২ I

এটিও ১২ মাত্রার একটি প্রদক্ষিণ ৪টি ৩ মাত্রার পদক্ষেপে সম্পূর্ণ হচ্ছে। আমরা এই তালটিকে বলি 'একতাল'।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই জাত নির্ণয় করতে হলে চালের দিকে ততটা নয় কিন্তু চলনের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। দিলে দেখা যাবে

ছন্দকে মোটের উপরে তিনজাতে ভাগ করা যায়। দুই মাত্রার চলনকে বলি সমমাত্রার চলন, তিনমাত্রার চলনকে বলি অসম মাত্রার চলন এবং দুই তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষম মাত্রার ছন্দ।...দুইয়ের গুণফল চার বা আটকেও আমরা একজাতিরই গণ্য করি।···তিনের মাত্রাটা টলটলে, গড়িয়ে যাবার দিকে তার ঝোঁক। এইজন্য তিনকে গুণ করে ছয় বা বারো করলেও তার চাপল্য ঘোচে না।·····বিষমমাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্ছে তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি আর এক অংশে বাধা। এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তার নৃত্য।"

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে কাব্য এবং সুরের সংযোগে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হল তার ভাব ও রূপকে যথাযথভাবে অক্ষুণ্ণ রেখে তালের প্রয়োগ করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি গান সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করবো।

'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে' গানটি স্বরবিতানে অসম ছন্দে অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক ছন্দে নিবদ্ধ আছে। গানের মধ্যে 'তা তা থৈ থৈ' নৃত্য ছন্দটিকে প্রকাশ করতে হলে অসম ছন্দে গাওয়া ভালো। কিন্তু কোন শিল্পী যদি তাঁর চিত্তের মধ্যে নৃত্যের আনন্দকে প্রকাশ করতে চান তাহলে সমছন্দে বা ষষ্ঠীতালে গাইতে পারেন। তেমনি 'সকল গর্ব দূর করি দিব' গানটি স্বরবিতানে একতালে নিবদ্ধ থাকলেও চৌতালে গাওয়া যেতে পারে। এতে গান দুটির মনোময় রূপটি নষ্ট হবে না। তবে সব গানের উপর এ পরীক্ষা চালানো উচিত হবে না। কাব্য সুর এবং ভাবের মর্যাদা সর্বাগ্রে।

এবার রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচলিত তালগুলি মাত্রাভাগ করে উদাহরণসহ উল্লেখ করছি—

১· দাদরা (অসম ছন্দ)

I ১ ২ ৩ । ৪ ৫ ৬ I

প্রলয় নাচন নাচলে যখন

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

২. কাহরবা সম ছন্দ

I ১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ ৭ ৮ I

আজ ধানের ক্ষেতে

দিনের বেলা বাঁশী তোমার

৩. তেওরা (বিষম ছন্দ)

I ১ ২ ৩ । ৪ ৫ । ৬ ৭ I

যখন তুমি বাঁধছিলে তার

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি

৪. অর্ধ ঝাঁপতাল (বিষম ছন্দ)

I ১ ২ । ৩ ৪ ৫ I

দীপ নিভে গেছে মম

আমি কী বলে করিব নিবেদন

৫. ঝাঁপতাল (বিষম ছন্দ)

I ১ ২ । ৩ ৪ ৫ । ৬ ৭ । ৮ ৯ ১০ I

তোমার আমার এই বিরহের

চরণ ধ্বনি শুনি তব নাথ

৬. সুরফাঁকতাল (সম ছন্দ)

I ১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯ ১০ I

প্রথম আদি তব শক্তি

শূন্য হাতে ফিরি হে

৭. ত্রিতাল (সম ছন্দ)

I ১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ ৭ ৮ । ৯ ১০ ১১ ১২ । ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ I

নবকুন্দধবলদল সুশীতলা

ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে

৮. একতাল (অসম ছন্দ)

I ১ ২ ৩ । ৪ ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯ । ১০ ১১ ১২ I

আমার হিয়ার মাঝে

প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ

৯. চৌতাল (সম ছন্দ)

I ১ ২ । ৩ ৪ । ৫ ৬ । ৭ ৮ । ৯ ১০ । ১১ ১২ I

বাণী তব ধায়

প্রভাতে বিমল আনন্দে

১০. আড়া চৌতাল (সম ছন্দ)

I ১ ২ । ৩ ৪ ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯ ১০ । ১১ ১২ ১৩ ১৪ I

শুভ্র আসনে বিরাজ

সংসারে কোনো ভয় নাহি

১১. ধামার (বিষম ছন্দ)

I ১ ২ ৩ । ৪ ৫ । ৬ ৭ । ৮ ৯ ১০ । ১১ ১২ ১৩ ১৪ I

সুধাসাগর তীরে

এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়

১২. পঞ্চম সোয়ারি (বিষম ছন্দ)

I ১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ ৭ ৮ । ৯ ১০ ১১ ১২ । ১৩ ১৪ ১৫ I

আজি মোর দ্বারে কাহার মুখ

নূতন তাল

"আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে নিয়ম আছে তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া নিগড় নয়। তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকে। সেইকথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সংকোচ বোধ করি নাই।

"কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানের তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কী উৎপাত ঘটিল একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করা যাক্, আমার গানের কথাটি এই—

কাঁপিছে দেহলতা থরথর

এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি যাঁরা কাব্যের

বৈঠকে দিব্যি খুশী ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন এ ছন্দের এক অংশে সাত আর এক অংশে চার ইহাতে কিছুতেই তাল মেলে না।

আমার জবাব এই, তাল যদি না মেলে সেটা তালের দোষ, ছন্দটাতে দোষ হয় নাই।"

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে নূতন তালগুলি কাব্যাংশের ছন্দ রক্ষা করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টির প্রেরণায় ও সৃজনপ্রতিভায় কবি শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের বন্ধনী সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করে গেছেন।

"আমরা শাসন মানিব। তাই বলিয়া অত্যাচার মানিব না। কেননা যে নিয়ম সত্য সে নিয়ম বাইরের জিনিষ নয়। তাহা বিশ্বের বলিয়াই তাহা আমার আপনার। যে নিয়ম ওস্তাদের তাহা আমার ভিতরে নাই, বাহিরে আছে; সুতরাং তাহাকে অভ্যাস করিয়া, ভয় করিয়া বা দায়ে পড়িয়া মানিতে হয়। এইরূপ মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সঙ্গীতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে থাকিবে।"

নীচে উদাহরণসহ নূতন তালের নাম দেওয়া হল। রূপকড়া, নবতাল, একাদশী ও নবপঞ্চকতালে উদাহরণে উল্লিখিত গান কয়টি ছাড়া আর কোন রচনা নেই। ঝম্পক ও ষষ্ঠী তালের রচনার সংখ্যা বহু।

১] ঝম্পক (বিষম ছন্দ)

I ১ ২ ৩ । ৪ ৫ I

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ

বিপদে মোরে রক্ষা কর

I ১ ২ ৩ ৪ ৫ I

ও চুপি চুপি কি বলে গেল

২। ষষ্ঠী (সম ছন্দ)

I ১ ২ । ৩ ৪ ৫ ৬ I

নিদ্রাহারা রাতের এ গান

I ১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ I

হৃদয় আমার প্রকাশ হল

I ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ I

হে সন্ন্যাসী হিমগিরি

৩। রূপকড়া (বিষম ছন্দ)

I ১ ২ ৩ । ৪ ৫ । ৬ ৭ ৮ I

ঐ রে তরী দিল খুলে

জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে

এই শরত আলোর কমলবনে

জীবনে যত পূজা

কত অজানারে জানাইলে

৪। নবতাল (বিষম ছন্দ)

I ১ ২ ৩ । ৪ ৫ । ৬ ৭ । ৮ ৯ I

নিবিড় ঘন আঁধারে

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে

I ১ ২ ৩ ৪ ৫ । ৬ ৭ ৮ ৯ I

ব্যাকুল বকুলের ফুলে

I ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ I

দুয়ার মোর পথ পাশে

৫। একাদশী (বিষম ছন্দ)

I ১ ২ ৩ । ৪ ৫ । ৬ ৭ । ৮ ৯ ১০ ১১ I

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া

I ১ ২ ৩ । ৪ ৫ ৬ ৭ । ৮ ৯ ১০ ১১ I

কাঁপিছে দেহলতা থরথর

৬। নব পঞ্চক (সম ছন্দ)

I ১ ২ । ৩ ৪ ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯ ১০ । ১১ ১২ ১৩ ১৪ I

জননী, তোমার করুণ চরণখানি

তালফেরতা

রবীন্দ্রসঙ্গীতে এমন কতকগুলি গান আছে যেগুলি গাইবার সময় একাধিক তালের প্রয়োগ দেখা যায়। সেই গানগুলিকে আমরা বলি তালফেরতা। কয়েকটি গানের একটি তালিকা দেওয়া গেল—

১। আনন্দ-ধ্বনি জাগাও গগনে
২। মধুগন্ধে ভরা
৩। হে নিরুপমা
৪। নৃত্যের তালে তালে
৪। ঐ আসে ঐ অতি
৬। বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে
৭। শুধু যাওয়া আসা
৮। কালী কালী বলরে আজ
৯। আমার মালার ফুলের দলে
১০। মধুর মিলন

আরো একটি গান আছে যেটি প্রথমে কাহরবা তালে সম্পূণ গেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দাদরা তালে আবার গাইতে হয়, গানটি হল—

আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা

ছন্দান্তর

রবীন্দ্রসঙ্গীতে এমন কতকগুলি রচনা আছে যাতে একই সুর রেখে একাধিক ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েকটি গানের তালিকা দেওয়া গেল। এ ছাড়া ৬৬ পৃষ্ঠায় সুরান্তর ও ছন্দান্তর দ্রষ্টব্য।

১। যেতে যেতে একলা পথে—ঝম্পক ও দাদরা
২। সংশয় তিমির মাঝে—ত্রিতাল ও তেওরা
৩। হেরি অহরহ তোমারি বিরহ—একতাল ও চৌতাল

৪। পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ—ঝাঁপতাল ও ঝম্পক

৫। শুধু তোমার বাণী– ঝাঁপতাল ও ষষ্ঠী

৬। উতল ধারায় বাদল ঝরে—কাহরবা ও রূপকড়া

৭। জীবনে যত পূজা—তেওড়া ও রূপকড়া

লয়

রবীন্দ্রসঙ্গীতে লয়কে মোটামুটিভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত। কয়েকটি গান ছাড়া প্রায় সব খেয়ালাঙ্গ বা ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি বিলম্বিত লয়ে গাইতে হয়। লোকসঙ্গীতের অন্তর্গত বাউল, ভাটিয়ালী, রামপ্রসাদী ইত্যাদি গানগুলি দ্রুত লয়ে গাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য গানগুলি প্রায় সবই মধ্য লয়ে গাওয়া হয়।

দেখা গেছে এক থেকে ছয় অবধি খুব তাড়াতাড়ি অথচ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সময় লাগে এক সেকেণ্ড। ছয় সংখ্যা অন্তর অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে মাত্রা হিসাবে করলে 'বিলম্বিত লয়' বলা হয়। এবং ঠিক ঐ ভাবে এক থেকে চার অবধি গুণে একটি করে মাত্রা হিসাব করলে বলা হয় 'মধ্য লয়'। আবার ঐভাবে এক থেকে তুই অবধি গুণে মাত্রা হিসাব করলে বলা হয় 'দ্রুত লয়'।

গানের ভাব ও স্বরবিন্যাস দেখে লয় স্থির করতে হয়। এবং মনে রাখতে হবে, যে-লয়ে গানটি ধরা হবে গানের শেষে যেন ঠিক সেই লয়টি বজায় থাকে।

সাধারণতঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায় যে গানের অন্তরা থেকে আস্থায়ীতে ফিরে আসবার সময় লয়ের গতি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। তবে নিয়মিতভাবে অনুশীলন করলে এ ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব এবং শিক্ষার প্রথমদিকেই তা হওয়া দরকার।

এইখানে বলে রাখি লয়-জ্ঞান খুব ভালভাবে আয়ত্ত না হলে তালফেরতা গানগুলি ঠিকমত পরিবেশন করা যাবে না।

তালফেরতা গানগুলি পরিবেশনের সময় লয়কে অটুট রেখে ছন্দ পরিবর্তন করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে দুই বা চার মাত্রার ছন্দ চলছে, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে তিন বা ছয় মাত্রার ছন্দ প্রয়োগ করা অভ্যাস করতে হয়।

হাতে তাল দিয়ে যদি সম্ভব না হয় তাহলে দেয়ালঘড়ি বা টাইম্‌পিস্‌ ঘড়ির সামনে বসে সেকেণ্ডের লয়ের সঙ্গে নিয়মিতভাবে এই অনুশীলন কিছুদিন চালিয়ে যেতে পারলে ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যাবে।

'ঐ আসে ঐ অতি' গানটির প্রথম স্তবকটি দ্বিমাত্রিক ছন্দে গাইতে হয়। এবং সেই লয় রক্ষা করে ত্রিমাত্রিক ছন্দে দ্বিতীয় স্তবকটি গাওয়া হয়। পরের স্তবকটি ছয় মাত্রার ছন্দ, লয়ের কোনো পরিবর্তন হবে না। চতুর্থ স্তবকটি পুনরায় তিন মাত্রার ছন্দ এবং সব শেষের স্তবকটি আবার ছয় মাত্রার ছন্দে গেয়ে আস্থায়ীতে দুই মাত্রার ছন্দে ফিরে আসতে হয়।

কোনো তালফেরতা গানে সম বা অসম ছন্দ থেকে যদি বিষম ছন্দের পরিবর্তন দেখা যায়, তাহলে লয়ের গতি সামান্য অদল-বদল করা চলতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে তাতে যেন গানের মনোময় রূপটি নষ্ট না হয় অথচ ছন্দবৈচিত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভাব ও রূপ

কবি বলেছেন, "প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্যে।"

এই কথাটির তাৎপর্য বুঝতে হলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। দেখলে বোঝা যাবে যে প্রথম জীবনে তাঁর গানগুলি সুরকে আশ্রয় করে রচিত।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে তৎকালীন বড় বড় সঙ্গীতগুণীদের আসর বসত। সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিভিন্ন সুর নিয়ে পিয়ানোতে পরীক্ষা চালাতেন এবং সেই সুরকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথকে কবিতা লিখতে বলতেন।

পরবর্তী জীবনে আমরা জানি সঙ্গীতরচনার সময় রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুর একই সঙ্গে এসেছে হরগৌরীর মত। এ সময়কার গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—"আমার মনে যে সুর এসেছিল সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে দেখা দিলে। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল তখন অবিমিশ্র সঙ্গীতের রূপ সে রচনা করলে না। সঙ্গীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোনটা বড় কোনটা ছোট বোঝা গেলো না।"

একেই আমরা বলি রূপ। ভাষা সুর ও ভাবের সুসমঞ্জস প্রকাশের নামই রূপ। আগেই বলেছি এই সময়কার গানগুলিই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা।

এই রূপকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে হলে সঙ্গীত-শিল্পীকে কবির মনোভাবটি নিজস্ব করে নিতে হবে। কথার অর্থকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। সুরের বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুষ্ঠু পরিবেশন সম্ভব।

৩০ পৃষ্ঠায় 'প্রেম' পর্যায়ে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

গীতবিতানের কথাগুলোকে স্বরবিতানের সুরে উচ্চারণ করলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত হবে না। সঙ্গীত পরিবেশনের সময় শিল্পীকে মনে মনে একটি শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশ তৈরি করে নিতে হবে। চিত্তপটে কল্পনার রঙ মিশিয়ে আঁকতে হবে সেই গানের ভাবরূপটি। তবেই তো তাঁর গান মধুর ও প্রাণবন্ত হবে। একমাত্র সুরুচিপূর্ণ শিল্পীমনের পক্ষেই তা সম্ভব।

উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সংযমী ও রুচিবান হতে হবে, রসিক হতে হবে আর সবার উপরে সাধনা করতে হবে একনিষ্ঠভাবে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখবার সময় কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সচেতন থাকতে হবে। কাব্যাংশের অর্থটি আগে বুঝতে হবে। কবির ভাবটিকে যতদূর সম্ভব নিজস্ব করে নেবার চেষ্টা থাকা চাই। আর চাই কবিমন দিয়ে গানের ভাব-রূপটিকে সুন্দর করে প্রকাশ করবার চেষ্টা। কারণ শিল্পী নিজেই যদি গানের ভাবটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে তাহলে শ্রোতাদের মনে সে ভাব জাগাবে কেমন করে?

এবার কয়েকটি গান পরিবেশনের জন্য কবির একটি রচনা থেকে পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা যাক—

"আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারা-বর্ষণে জগতে আর যত কিছু কথা আছে, সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়—এবং যে কখনো একটি কথা কইতে জানে না, সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে।

"অন্ধকারকে ঠিক মতো তার উপযুক্ত ভাষায় যদি কেউ কথা কওয়াতে পারে, তবে সে এই শ্রাবণের ধারাপতনধ্বনি।

"অন্ধকারে নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্ ঝর্ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর করে ধ্বনিয়ে তোলে। বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টি পতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।

"আজ এই ঘনবর্ষার সন্ধ্যায় প্রকৃতির শ্রাবণ-অন্ধকারের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিলতে চাচ্ছে। অব্যক্ত আজ ব্যক্তের সঙ্গে লীলা করবে বলে আমাদের দ্বারে এসে আঘাত করছে।

"আজ কেবলি মনে হচ্ছে এই যে বর্ষা, এ তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল্ শ্রাবণধারা। যত দূর চেয়ে দেখি, আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহ সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার—তারি দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে···চির দিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে, এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আছে—তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে, সে আছে, বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে···"

মনে মনে এই পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়ে যে গানগুলো গাওয়া যেতে পারে তার কয়েকটি নীচে দেওয়া গেল।

১। আমি তখন ছিলেম মগন
২। সঘন গহন রাত্রি
৩। মেঘের পরে মেঘ জমেছে
৪। আজি তোমায় আবার
৫। আমি কী গান গাব যে
৬। বাদল বাউল বাজায়
৭। আমার দিন ফুরালো
৮। অশ্রুভরা বেদনা
৯। কোথা যে উধাও হল

১০। আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
১১। এসো গো জেলে দিয়ে যাও
১২। স্বপ্নে আমার মনে হল
১৩। আমি শ্রাবণ-আকাশে ঐ
১৪। বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে

ধর্মসঙ্গীত ও প্রেমবৈচিত্র্যের অনেক গানের পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম' এবং 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থদ্বয় থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রথম-প্রথম এইভাবে অভ্যাস করলে পরে শিক্ষার্থী নিজেই মনে মনে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তাঁর কল্পনাকে কাজে লাগতে পারবেন।

কবি বলেছেন, "আমাদের দেশের গাইয়ে বাজিয়েরা কিছুতেই মনে রাখে না যে আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি। কেননা রূপকে সুব্যক্ত করাই তার কাজ। বিহিত সীমার দ্বারা রূপ সত্য হয়, সেই সীমা ছাড়িয়ে অতিকৃতিই বিকৃতি।...গান যে বানায় আর গান যে করে, উভয়ের মধ্যে যদি বা দরদের যোগ থাকে তবু সৃষ্টি-শক্তির সাম্য থাকা সচরাচর সম্ভব নয়...আমাদের দেশে গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে, তখন সে সৃষ্টিকর্তার কাঁধের উপর চড়ে ব্যায়ামকর্তার বাহাদুরী প্রচার করে। উত্তরে কেউ বলতে পারেন, ভালো তো লাগে কিন্তু পেটুকের ভালো লাগা আর রসিকের ভালো লাগা এক নয়। কী ভালো লাগে তাই নিয়ে তর্ক। যে ময়রা রসগোল্লা তৈরি করে মিষ্টান্নের সঙ্গে যথা-পরিমিত রস সে নিজেই জুগিয়ে দেয়। পরিবেশন-কর্তা মিষ্টান্ন গড়তে পারে না, কিন্তু দেদার চিনির রস দেওয়া তার পক্ষে সহজ। সেই চিনির রস ভালো লাগে অনেকের; তা হোক গে, তবুও সেই ভালো লাগাতেই আর্টের যথার্থ যাচাই নয়।" (রচনাবলী ২২ পৃষ্ঠা ৪৮২-৮৩)

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাদ্যযন্ত্র

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের সময় বেশী বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য না নেওয়াই ভালো। তাহলে "বরযাত্রীর ভিড়ে বরকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।" সুর রাখার জন্য তানপুরা, এসরাজ বা বাঁশীই যথেষ্ট এবং শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য গানের সুরটি ছাড়া আর কিছু বাজানো উচিত নয় বলে মনে করি।

ছন্দ রক্ষার জন্য সঙ্গতের প্রয়োজন অবশ্যই স্বীকার করি কিন্তু তার কেরামতি বা বাহাদুরি অসহ্য। মনে রাখতে হবে সঙ্গীতই এখানে মুখ্য, পরিবেশনের সময় তার সৌন্দর্য বা মাধুর্য অক্ষুন্ন রাখার জন্যে সচেষ্ট থাকতে হবে।

ধ্রুপদাঙ্গ বা খেয়ালাঙ্গ গানগুলি পরিবেশনের সময় পাখোয়াজের গাম্ভীর্যপূর্ণ সঙ্গত খুবই ভালো লাগে। এ ছাড়া আর সমস্ত গানে খোলের সঙ্গত থাকলে ভালো হয়। তবে সব গানের সঙ্গে ছন্দের প্রতি পদক্ষেপে মন্দিরার সুমধুর ধ্বনি মন্দির-সুলভ পরিবেশ সৃষ্টি করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কণ্ঠ

সাধারণভবে একটা মতবাদ প্রায়ই শোনা যায় যে, মিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী যাঁরা, একমাত্র তাঁদেরই উচিত সঙ্গীতের সাধনা করা। কিন্তু এ মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তবে গলাটি সুরেলা হওয়া চাই অর্থাৎ সুরের উপর তাঁদের সম্পূর্ণ দখল থাকা চাই।

শাস্ত্রসম্মত প্রথায় নিয়মিত শিক্ষা ও সাধনা করলে যে কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষেই রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্ভব। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করি—"একপ্রকারে মিষ্টতা আছে তাহা নিঃসংশয়ে

মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট, তাহা নিজের লালিত্য সপ্রমাণ করিতে মুহূর্ত মাত্র সময় লয় না। ইন্দ্রিয়ের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য লইয়া মন তাহার সৌন্দর্য স্বীকার করিতে কিছুমাত্র তর্ক করে না। তাহা আমাদের মনের নিজের আবিষ্কার নহে। ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে পাওয়া। এইজন্য মন তাহাকে অবজ্ঞা করে, বলে, ও নিতান্তই মিষ্ট। অর্থাৎ উহার মিষ্টতা বুঝিতে অন্তঃকরণের কোনো প্রয়োজন হয় না, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বোঝা যায়; যাহারা গানের সমজদার এইজন্যই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমুক লোক মিষ্ট গান করে। ভাবটা এই যে, মিষ্ট গায়ক গানকে আমাদের ইন্দ্রিয়-সভায় আনিয়া নিতান্ত সুলভ প্রশংসা দ্বারা অপমানিত করে। মার্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনের দরবারে সে প্রবেশ করে না। ...বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিসের মূল্য নামাইয়া দেয়।

"সর্বপ্রকার কলাবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন এক পক্ষ বলে, তুমি কী বুঝিবে। আর এক পক্ষ রাগ করিয়া বলে, যাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝ, জগতে আর কেহ বোঝে না।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫ ॥ পৃ, ৪৫৩-৫৪)

অতএব দেখা যাচ্ছে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মত রবীন্দ্রসঙ্গীতও বাইরের জিনিস নয়, অন্তরের জিনিস। সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে হয়। শিল্পীর নিজেরই মন যদি সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত মাধুর্যে বা আনন্দে না ভরে ওঠে, তবে সে কেমন করে শ্রোতার মন ভরাবে? মিষ্টকণ্ঠ হলেই তা সম্ভব হবে, একথা মানতে মন চায় না।

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে কণ্ঠস্বরের প্রয়োগ তিনরকম ভাবে করতে হয়। উদ্দীপক সঙ্গীতে তেজালো ভাবে এবং উচ্চ সপ্তক, মীড় বা টপ্পার গিটকিরির সময় নরমভাবে এবং অন্য সময়ে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করলে ভাব ও রূপ প্রকাশ করা সহজ হবে।

নৃত্য

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আমাদের বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো নৃত্যপদ্ধতি ছিল না। আর থাকলেও কোনো দরবারী আসরে বা গুণীসমাজে চারুকলা হিসেবে আদৃত হয়নি। আউল-বাউলদের নৃত্য ছিল ছন্দবহুল এবং তার অভিব্যক্তি ছিল অত্যন্ত স্থূল।

বাংলাদেশের বাইরে ছিল কথাকলি, ভারতনাট্যম্, কত্থক ও মণিপুরী। এই নৃত্য পদ্ধতির আতিশয্যকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে কেবল সৌন্দর্যের উপকরণগুলির সুসমঞ্জস মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথ এক অপূর্ব নৃত্যকলার প্রবর্তন বা প্রচলন করলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে নৃত্যশিল্পী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত ও অনুমোদিত নৃত্য পদ্ধতিটিকে তাঁর সঙ্গীতে প্রয়োগ করে আমরা নৃত্য-বিচিত্রা বা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে থাকি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বহুমুখী। শান্তিনিকেতনের ধারায় নৃত্যকলা সেই প্রতিভার আর এক সৃষ্টি।

বাঙালীর সমাজে একদিন যা ছিল অবহেলিত ও অপাঙক্তেয় রবীন্দ্রনাথের কৃপায় আজ সেই নৃত্যকলা প্রতি ঘরে-ঘরে প্রচলিত ও আদৃত।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভার আর তাকে চালন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ; এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পর মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে; দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।"

এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। নৃত্য পরিবেশনের সময় অঙ্গভঙ্গিমা যেন সংযত ও রুচিপূর্ণ হয়।

মুদ্রার খুব প্রয়োজন বা প্রচলন নেই কিন্তু দৈহিক সঙ্গতি বা দেহের হিল্লোলে থাকবে ভাবের ব্যঞ্জনা আর ছন্দের বৈচিত্র্য।

রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করি, "নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ। গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালে একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি, সে কেবল তালের নেশা জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল দেওয়া। তার সঙ্গে ক্রমে ভাবের দোলা মেশে। কিন্তু এই ভাবব্যক্তি যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই যখন লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ করে রূপসৃষ্টিই হয় চরম, তখন নাচটা হয় সর্বজনের ভোগ্য ; সেই নাচটা ক্ষণকালের পরে বিস্মৃত হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে।"

অতএব দেখা যাচ্ছে, মন মুখরিত হয় গানে। মুখরা যখন মূক হয় তখন অঙ্গসঞ্চালনেই সে নিজেকে ব্যক্ত করে। তাই নৃত্যকে বলি মূকের ভাষা। অক্ষর তার অঙ্গের প্রতি ভঙ্গিমায়। বাক্য তার দেহের আন্দোলনে আর ছন্দ তার প্রতি পদক্ষেপে।

'তপতী' 'নটীর পূজা' ইত্যাদি গীতিনাট্যে সঙ্গীত মুখ্য, নৃত্য তাকে অনুসরণ করে। 'চিত্রাঙ্গদা' 'শ্যামা' 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে নৃত্য মুখ্য, সঙ্গীত তার অনুগামী। এই নৃত্যনাট্যগুলি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

শুধু বাংলায় নয়, সারা বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের স্থান অনেক উঁচুতে।

এই কথা মনে রেখে, রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে রক্ষা করে নৃত্য-পরিচালন বা পরিবেশন করলে ললিতকলার সম্যক বিকাশ ঘটবে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে যন্ত্রসঙ্গীত

আজকাল গীটারে, এসরাজে, বেহালায় ইত্যাদিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর এককভাবে বা সমবেতভাবে পরিবেশন করা হয়। কথা বাদ দিয়ে

কেবল সুরের সাহায্যে রস সঞ্চার করা বড় সহজ কথা নয়। এতেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের সুর-বিন্যাস কত উচ্চস্তরের।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ খেয়াল শ্রেণীর উচ্চাঙ্গ সুরের পরিবেশন প্রায়ই শোনা যায় না, যা শোনা যায় তা নামী শিল্পীদের রেকর্ডের বা ফিল্মের গান। উচ্চাঙ্গ শ্রেণীর সুরগুলিও যাতে যথাযথ ভাবে পরিবেশিত হয় সেদিকে ভবিষ্যৎ শিল্পীদের সচেষ্ট হতে অনুরোধ করি।

নীচে প্রত্যেকটি ঠাটের একটি করে গান দেওয়া গেল। সামান্য আলাপের পর ঈষৎ বিলম্বিত লয়ে পাখোয়াজ ও মন্দিরা সহযোগে পরিবেশনের চেষ্টা করা যেতে পারে।

১। ডাকে বার বার ডাকে—কেদারা (কল্যাণ)
২। মনে রয়ে গেল মনের কথা—বেহাগড়া (বিলাবল)
৩। নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে—বাগেশ্রী (কাফি)
৪। দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া—সুরট মল্লার (খাম্বাজ)
৫। আঁখিজল মুছাইলে—রামকেলি (ভৈরব)
৬। মনোমোহন গহন—আশাবরী (আশাবরী)
৭। বুঝি বেলা বহে যায়—মূলতান (টোড়ি)
৮। অশ্রুনদীর সুদূর পারে—পূরবী (পূরবী)
৯। প্রথম আদি তব শক্তি—দীপক পঞ্চম (মাড়োয়া)
১০। আনন্দধারা বহিছে ভুবনে—মালকোশ (ভৈরবী)

একটি উদ্ধৃতি

সবশেষে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখ করে এই গ্রন্থের সমাপ্তি-রেখা টানবো—

"সঙ্গীতের মত এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজাল বিদ্যা-জগতে আর কিছুই নেই—এ এক নতুন সৃষ্টিকর্তা। আমি তো ভেবে পাইনে, সঙ্গীত একটা নতুন মায়াজগৎ সৃষ্টি করে, না এই পুরাতন জগতের অন্তরতম অপরূপ নিত্যরাজ্য উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। গান প্রভৃতি কতগুলি জিনিস আছে

যা মানুষকে এই কথা বলে যে—তোমরা জগতের সকল জিনিসকে যতই পরিষ্কার বুদ্ধিগম্য করতে চেষ্টা করো না কেন এর আসল জিনিসটাই অনির্বচনীয় এবং তারই সঙ্গে আমাদের মর্মের মর্মান্তিক যোগ। তারই জন্যে আমাদের এত দুঃখ, এত সুখ, এত ব্যাকুলতা—”
(ছিন্নপত্র, পত্র-সংখ্যা-২২৯ পৃ ৪৭৪-৪৭৫)